তথ্য কণিকা ২০২৩

গাছ লাগিয়ে যত্ন করি
সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

বাংলাদেশের বন ---------- ৩
পাহাড়ি বন ---------- ৩
শাল বন ---------- ৩
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন ---------- ৪
জলাভূমির বন ---------- ৪
সৃজিত উপকূলীয় বন ---------- ৫
উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য ---------- ৬
জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন ---------- ৬
বন অধিদপ্তরের নার্সারী ---------- ৭
সামাজিক বনায়ন ---------- ৭
সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য ---------- ৮
রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং গুরুত্ব ---------- ৯
সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন ---------- ১০
বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ---------- ১০
রক্ষিত এলাকা সমূহ ---------- ১১
সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ---------- ১২
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ---------- ১৩
বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী ---------- ১৪
বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ ---------- ১৭
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিধিমালা ও নীতিমালা ---------- ১৮
বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ---------- ১৮
শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার ---------- ২২
বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ পর্যটন ---------- ২৩
সাফারী পার্ক ---------- ২৪
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার ---------- ২৪
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর ---------- ২৬
জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ---------- ২৮
বন সেক্টরের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি ---------- ২৮
প্রকল্প তালিকা ---------- ২৯
টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প ---------- ৩০
বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ---------- ৩৬
সুন্দরবনের বাঘ শুমারী ---------- ৩৭
বাংলাদেশ বন মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭) ---------- ৩৮
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ---------- ৩৮
ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) ---------- ৩৯
বন অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ---------- ৪০
বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ---------- ৪০
বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ---------- ৪১
বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ---------- ৪১
উদযাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ ---------- ৪২
বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক দিবস ---------- ৪৬
কক্সবাজার জেলায় সংরক্ষিত বনভূমিতে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক কর্তৃক বসতি স্থাপন, বনজ সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসের তথ্যাদি ---------- ৪৭
East Asia Australasian Flyway Partnership (EAAFP) Sites in Bangladesh ---------- ৫২
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ---------- ৫৫
বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের অর্জন ---------- ৫৬
বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত কতিপয় প্রয়োজনীয় তথ্য ---------- ৫৮

বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ি বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

পাহাড়ি বন

অবস্থান: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকা।

মাতামুহুরী সংরক্ষিত বন

পরিমাণ: উল্লিখিত জেলাসমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ি বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ৪.৫৪% এবং বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৪৩%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই,ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।

শাল বন

অবস্থান: এ বন মূলতঃ কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু শাল বন রয়েছে।

শাল বন, গাজীপুরের

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ০.৮১% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৭%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের মূল প্রজাতি শাল (Shorea robusta), যা অনেকেই গজারী বলে জানেন। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়। এ ছাড়া এ বনে হরিতকি, বহেরা, কড়ই, শিমুল, অর্জুন ইত্যাদি প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

অবস্থান: খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ বন অবস্থিত।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ৪.০৭% এবং যা বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৩৮%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়া ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শুকর, কুমির, অজগর ইত্যাদি।

নদী/খাল: এ বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মংগল ইত্যাদি। তাছাড়া শত শত খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

মৎস্য সম্পদ: শুধু বৃক্ষসম্পদ নয়, এ বন মৎস্য সম্পদেরও এক বিরাট আধার। এ বনে ইলিশ, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, চিংড়ি, চিত্রা ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

বিশ্ব ঐতিহ্য: সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জলাভূমির বন

অবস্থানঃ সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত। রাতারগুল দেশের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন জলভূমির বন। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় এ বন অবস্থিত।

রাতারগুল জলাভূমির বন, সিলেট

পরিমাণ: রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ০.০১%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো- হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ ইত্যাদি। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে।

বন্যপ্রাণী: বানর, মেছোবাঘ, ভোঁদড়, কাঠবিড়ালী, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন মিঠা পানির মাছের আবাসস্থল ও প্রজননের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃজিত উপকূলীয় বন

অবস্থান: নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃজন করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারা বনও বলা হয়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে। এ বন জেগে ওঠা চরভূমিকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় করে কৃষি কাজসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে।

সৃজিত উপকূলীয় বন, পটুয়াখালী

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৫২ হাজার ১ শত হেক্টর; যা দেশের আয়তনের ১.৭০ % এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ১৫.৭৫%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: কেওড়া, ছৈলা, গেওয়া, কাকড়া, বাইন, ধুন্দল, পশুর, সুন্দরী, গোলপাতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মতো এ বনও জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়।

বন্যপ্রাণী: হরিণ, মেছোবাঘ, কুমির, শুকর, শিয়াল, বানর, বনবিড়াল, বালিহাঁস ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। এখানে ভেটকি, লইট্যা, পারসে, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা করছে এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দৃঢ় করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী হিসেবে কাজ করছে; সেই সাথে দেশে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মৎসসমূহের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

- বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার ৫ শত ২১ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গন-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।
- উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।

জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন

বন অধিদপ্তর ও যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এর যৌথ গবেষণায় ২০১৪ সালের **Landsat** স্যাটেলাইট ইমেজ (Image Resolution 30m) এর তথ্য বিশ্লেষন করে বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। নিম্নে তার তথ্য উপস্থাপন করা হল:

জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন (বর্গ কিঃ মিঃ)	বৃক্ষ আচ্ছাদন %	জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন % (বর্গ কিঃ মিঃ)	বৃক্ষ আচ্ছাদন %
বাগেরহাট	২১০১.৫৫	৫০.৪৪	লালমনিরহাট	১২১.৯৯	৯.৮৪
বান্দরবান	৩৪০৩.৪৬	৭৩.৬৭	মাদারীপুর	১০৪.৫৪	৯.২৪
বরগুনা	৩০৮.৭৪	১৭.৯২	মাগুরা	১৭৫.৪৮	১৬.৮২
বরিশাল	৫৬৯.১১	২২.০৮	মানিকগঞ্জ	১৪৫.২৬	১০.৪৩
ভোলা	৬৬৩.৬৫	১৭.৫২	মৌলভীবাজার	৯০১.৩৫	৩৩.৩২
বগুড়া	২৬৭.৬০	৯.১৩	মেহেরপুর	৯০.৭৫	১২.৮৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩৪.৭২	৬.৯৪	মুন্সিগঞ্জ	৫০.২১	৫.৩৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৩৯.৮৬	১৪.৩৭	ময়মনসিংহ	৮২০.৬৮	১৮.৯৪
চাঁদপুর	৩৪১.৫১	১৯.৯৩	নওগাঁ	১৫৭.১৫	৪.৫৯
চট্টগ্রাম	১৫৭২.৭৯	২৬.৮৪	নড়াইল	১০৫.৬৯	১০.৬৯
চুয়াডাঙ্গা	১৭৫.০৯	১৫.২৩	নারায়ণগঞ্জ	৪৩.০৯	৬.০৮
কুমিল্লা	৪১৬.৬৪	১৩.৩৬	নরসিংদী	৩৩৬.৬০	২৮.৯৮
কক্সবাজার	৬১৫.৫৭	২০.২৮	নাটোর	২৬২.৯১	১৩.৮১
ঢাকা	১৬৪.৪৩	১১.১৮	নেত্রকোনা	২৫৮.৫৮	৯.২৫
দিনাজপুর	১৫০.২১	৪.৩৫	নীলফামারী	১১১.১২	৬.৯৭
ফরিদপুর	২৫০.২০	১২.৩৩	নোয়াখালী	৫৪১.৮৪	১২.৬৫
ফেনী	২০৬.৯৭	২২.৩৪	পাবনা	২৬৮.৯২	১১.৩২
গাইবান্ধা	১৮১.২৭	৮.৪৪	পঞ্চগড়	৬৪.৬৯	৪.৬৪
গাজীপুর	৬১৫.৮৩	৩৩.৯২	পটুয়াখালী	৪৬৩.০৩	১৩.৩৪
গোপালগঞ্জ	১০৬.৩৬	৭.১৮	পিরোজপুর	৪৫২.৫১	৩৫.৫৩
হবিগঞ্জ	৪২৭.৩২	১৬.৩৭	রাজবাড়ী	১৫৫.৮০	১৩.৬৬
জামালপুর	২১৮.১৯	১০.৬১	রাজশাহী	২৬৩.৫৯	১০.৮৯
যশোর	৫৮৬.৯৯	২২.৯২	রাঙ্গামাটি	৪০১৪.৩৩	৭০.২৬
ঝালকাঠি	২৬৩.৮১	৩৫.৫০	রংপুর	২৮১.৭২	১১.৯৪
ঝিনাইদহ	৩৫৫.৯৬	১৮.২১	সাতক্ষীরা	১৩৩১.৩৮	৩৩.৬১
জয়পুরহাট	৬২.৬৭	৬.৩২	শরীয়তপুর	১৩৭.৯৮	১১.৪৯
খাগড়াছড়ি	১৯৮৬.৭৬	৬৭.৩১	শেরপুর	১৭৯.৯১	১৩.৭২
খুলনা	১৮০৯.৫১	৪০.৯১	সিরাজগঞ্জ	২২১.৬৪	৮.৮৩
কিশোরগঞ্জ	৩১৬.০২	১২.৩২	সুনামগঞ্জ	১৭৩.৯৫	৪.৭৫
কুড়িগ্রাম	২৩৬.২৭	১০.৩২	সিলেট	৬০১.৮৪	১৭.৫২
কুষ্টিয়া	২৫০.৪০	১৫.৩৬	টাঙ্গাইল	৭০৯.৭১	২১.০৩
লক্ষীপুর	৪৩৮.৮০	২৯.২১	ঠাকুরগাঁও	৩০.৪৯	১.৭০
বৃক্ষ আচ্ছাদনের মোট ভূমির পরিমাণ				৩৩০১২	২২.৩৭

বন অধিদপ্তরের নার্সারী

বন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলায় মোট ১০১টি এস.এফ.এন.টি.সি (সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এবং ৩১২টি উপজেলায় এস.এফ.পি.সি (উপজেলা সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র) রয়েছে। বন বিভাগে বিদ্যমান এ ৪১৩টি নার্সারীতে বিভিন্ন বনজ, ফলজ, ঔষধি, শোভাবর্ধনকারী ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন করতঃ সরকারী মূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ২০০২ সাল হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত সারা দেশে ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন নার্সারী কর্তৃক ১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ২০৮ টি বিবিধ প্রজাতির বনজ, ফলদ, ঔষধি, শোভাবর্ধনকারী ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন পূর্বক সরকারী স্বল্প মূল্যে বিক্রয়/বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এসকল নার্সারীতে বিক্রয়/বিতরণের জন্য ২৩,২৭,২৫০ টি চারা উত্তোলন করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন হলো স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রম। ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করাই সামাজিক বনায়নের প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা এবং তাদের খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী, আসবাবপত্র ও মূলধনের চাহিদা পূরণ করা। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ সৃষ্টি, মরুময়তা রোধ, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যতা নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সামাজিক বন বিভাগ, দিনাজপুর এর সামাজিক বনায়ন কর্মকান্ড

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ১৯৬০-এর দশকে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচি বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৮১-৮২ সাল হতে উত্তরবঙ্গের সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য বৃহত্তর ৭টি জেলায় কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের প্রচলন করে। সরকার ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসে। সামাজিক বনায়নকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রবর্তন করে। এ বিধিমালা-কে আরো যুগোপোযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১০ ও ২০১১ সালে উহাতে সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত বিধিমালায় সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২১ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ (২০১০-২০১১ সনে সংশোধিত)-এর অধিকতর সংশোধনী প্রস্তাব, ২০২১ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে। যার যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আবর্তকাল ও উপকারভোগী নির্বাচন

সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বাগানের আবর্তকাল ন্যূনতম ১০ বছর। সৃজিত স্ট্রিপবাগানে প্রতি কিলোমিটারে সর্বনিম্ন ৫ জন এবং উডলট/ব্লক বাগান/বাফারজোন/এগ্রোফরেস্ট্রি/উপকূলীয় চরভূমি/ ফোরশোর ইত্যাদি বাগানে প্রতি হেক্টরে ১ জন হিসেবে উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়। অধিকাংশ উপকারভোগী সৃজিত উডলট ও কৃষি বন বাগানে অন্তর্বর্তীকালীন ফসল হিসেবে আদা, হলুদ, আনারস, গম, চীনাবাদাম, কচু, লেবু, সব্জি এবং ঔষধি গাছপালা ও অন্যান্য ফসল চাষ করে লাভবান হয়। অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা অনুযায়ী সামাজিক বন থেকে প্রথম ৭ বছর পর্যন্ত প্রুনিং ও থিনিং কালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলদ বৃক্ষের ফল, উৎপাদিত কৃষি ফসল ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সকল আয় সম্পূর্ণরূপে উপকারভোগীগণ পেয়ে থাকেন এবং আবর্তকাল শেষে বৃক্ষ কর্তন পূর্বক লভ্যাংশ চুক্তিনামা (PBSA) অনুযায়ী উপকারভোগীদের মাঝে বন্টন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মধ্যে লভ্যাংশের চেক বিতরণ করার সময় ভার্চুয়ালী উপস্থিত ছিলেন

সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

- সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার ২৮৩.০৩ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৭৮ হাজার ৮৩২.৩৬ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ৮৯০০ হেক্টর ব্লক বাগান ও ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন ৪৬০০ হেক্টর এবং ৮০০ সিড়লিং কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সৃজিত বাগানে ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০৬ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৪২ জন।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগান সমূহ হতে মোট ৫০ হাজার ৬৩৫.২৪ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ২৪ হাজার ৫৯৪.৪৮ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য মোট ১৬৫৬ কোটি ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৫১ টাকা মাত্র।
- এ যাবৎ ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮০৬ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৪৪১ কোটি ২৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৯২ টাকা বিতরন করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত পুনঃবনায়ন কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) মোট ১৩৬ কোটি ৯১ লক্ষ ২২ হাজার ৯৩৩ টাকা জমা করা রয়েছে।
- এ যাবৎ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমান মোট ৫৮৬ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৪৪ টাকা মাত্র।
- ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে বিতরণকৃত টাকার পরিমান মোট ২৪৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ২০৮ টাকা মাত্র।

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং এর গুরত্ব

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৩১) অনুসারে "সহ-ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোনো একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায়।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘকালের চলে আসা প্রথাগত পদ্ধতির নানা দুর্বলতা দূর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বিশেষতঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আশার সঞ্চার করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতি আদর্শ একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ ও ইউএসআইডি যৌথ উদ্যোগে নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (২০০৪-২০০৮) এর মাধ্যমে ৫টি রক্ষিত এলাকায়, সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ- ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা আইপ্যাক প্রকল্প (২০০৮-২০১৩) এর মাধ্যমে ১৮টি রক্ষিত এলাকায় এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকা বা ক্রেল প্রকল্প (২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নীতির ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ন্যায় ভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি অর্জনযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সুষ্ঠ বাস্তবায়ন আবশ্যক। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী ও অন্যান্য অংশীজন সরকারের পাশাপাশি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুষ্ঠ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও খাদ্যের উৎস এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা, বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের আবাসস্থল এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবেও রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, দারিদ্র্য, জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ, অবৈধভাবে গাছকর্তন, বন বিভাগের পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, গবাদি পশুর বিচরণ, বনে আগুন এবং সর্বোপরি বনভূমি কৃষি ও জনবসতিতে পরিনত হওয়ায় বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা সমুহ হুমকির সম্মুখীন।

এ প্রেক্ষাপটে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের বনবিভাগ পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় আটটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায়, ২০১৫ পর্যন্ত বনবিভাগ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP, ২০০৩-২০০৮), সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (IPAC, ২০০৮-২০১৩) এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ প্রকল্প (CREL, ২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় ২৮ টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রকল্প নির্ভরতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দূর্বলতার কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনও আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রনয়ন করেছে, যার সফল বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের উন্নয়ন হবে। বিশ্বব্যংকের অর্থায়নে চলমান টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প (২০১৯-২০২৩) এর আওতায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করণ ও নতুন রক্ষিত এলাকায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক বনায়নে নার্সারিতে চারা উৎপাদন, পরিচর্যা, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীল করা হয়ে থাকে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (২০০৪) অনুযায়ী ৩০% দুঃস্থ নারী উপকারভোগী হওয়ায় সুযোগ পেয়ে থাকেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ দুইজন নারী থাকেন। বিধি ৭ এর (১) উপবিধিতে চুক্তির আওতায় উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা এর ক্ষেত্রে স্ত্রী ও স্বামীকে সমান অধিকার অর্পণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুযায়ী গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস্ ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ ও নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পর্যায়ে এবং দাপ্তরিক পদমর্যাদায় নারীর অবস্থানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

দেশজুড়ে হাজারো প্রান্তিক নারীকে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় এনে পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি তাদের জীবনমান পরিবর্তনের মাধ্যমে সুন্দর ও স্বাবলম্বী জীবনের স্বপ্ন বোনায় সহায়তা করছে বন অধিদপ্তরের সুফল প্রকল্প।

সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় নারী

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সুসংহতকরণে সচেষ্ট। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য মর্মে সরকার মনে করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গেও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ পর্যন্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন অধিদপ্তর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭,৭৮৫ হেক্টর ব্লক বাগান, ১২,২৯০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ২,০৯৮ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীসহ ভূমি মালিক সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদ-কে পূর্বেকার বকেয়াসহ এ অর্থ বৎসরে ৪৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে। বনায়নের বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্রধীন এলাকায় ৪,৬০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজিত হয়েছে। এছাড়াও ৮৯০০ হেক্টর ব্লক বাগান ও ৮০০ সিডলিং কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রক্ষিত এলাকা সমূহ (এপ্রিল ২০২৩ সন পর্যন্ত)

জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার ঘোষিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকো পার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন- এ সকল এলাকা রক্ষিত এলাকার অন্তর্ভূক্ত। দেশে বর্তমানে এপ্রিল ২০২৩ সন পর্যন্ত রক্ষিত এলাকার (Terrestrial & Marine) পরিমাণ ৮,১৭,৮৪০.৪৭৫ হেক্টর। এর মধ্যে Terrestrial রক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৪,৬৯,৭৪০.৪৭৫ হেক্টর; যা দেশের মোট আয়তনের ৩.১৮ শতাংশ।

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারা দেশে সর্বমোট ৫২ টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তারমধ্যে ১৯ টি জাতীয় উদ্যান, ১ টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২৫ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ২ টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ৩ টি ইকোপার্ক এবং ২ টি মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া রয়েছে (তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত)। তাছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য ২ টি শকুন নিরাপদ এলাকা (ভালচার সেফ জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য:

১. রেমাকালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২. ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৩. হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৪. চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৫. দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৬. পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৭. সাংগু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৮. টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৯. সোনার চর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১০. চর কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১১. টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১২. সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৩. সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৪. সুন্দরবন দক্ষিন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৫. চাঁদপাই বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৬. দুধমুখী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৭. ঢাংমারী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৮. নগরবাড়ী- মোহনগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য
১৯. শিলন্দা নাগডেমরা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২০. নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২১. পানখালী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২২. শিবসা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২৩. ভদ্রা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২৪. পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২৫. বাইশারী ব্যাংডেপা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

জাতীয় উদ্যান:

১. ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান
২. মধুপুর জাতীয় উদ্যান
৩. রামসাগর জাতীয় উদ্যান
৪. হিমছড়িজাতীয় উদ্যান
৫. লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
৬. কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান
৭. নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান
৮. মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান
৯. সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান
১০. খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান
১১. বাড়ৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান
১২. কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান
১৩. নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান
১৪. সিংড়া জাতীয় উদ্যান
১৫. কাদিগড়জাতীয় উদ্যান
১৬. আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান
১৭. বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান
১৮. শেখ জামাল ইনানী জাতীয় উদ্যান
১৯. ধর্মপুর জাতীয় উদ্যান

উদ্ভিদ উদ্যান:

১. জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর

বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা:

১. রাতারগুল বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা
২. আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

ইকোপার্ক:

১. চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক
২. টিলাগড় ইকোপার্ক ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র
৩. মাধবকুন্ড ইকোপার্ক

মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া:

১. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া
২. সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

- রক্ষিত এলাকা (Protected Area) ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও রক্ষিত এলাকার ন্যায় কাজ করছে বা ব্যবহৃত হচ্ছে এমন ইকোপার্ক/সাফারী পার্ক এর তালিকা নিম্নরূপ ঃ

(ক) ইকোপার্ক:

১. সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক
২. মধুটিলা ইকোপার্ক
৩. বাঁশখালি ইকোপার্ক
৪. কুয়াকাটা ইকোপার্ক
৫. বরশীজোড়া ইকোপার্ক
৬. যমুনা সেতু পশ্চিম পাড় ইকোপার্ক
৭. পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক

(খ) সাফারী পার্ক ঃ

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার
২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর ধারা ১৩ (১) এবং ১৩ (২) এর ক্ষমতা বলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রজ্ঞাপন মূলে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড এর ১৭৩৮.০০ বর্গ কিলোমিটার অংশকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (যেমন-ইরাবতী ডলফিন, গোলাপি ডলফিন, বোতলনাক ডলফিন, চিত্রা ডলফিন, ঘুর্নি ডলফিন) পাখনাহীন শুশুক, কয়েক প্রজাতির তিমি (যেমন-ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি ইত্যাদি) এবং হাঙ্গর (হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুট্টি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর, করাতি হাঙ্গর ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে "সোয়াচঅব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেকক্টেড এরিয়া" হিসেবে ঘোষণা করা হয়; যার গড় গভীরতা ৯০০+ মিটার।

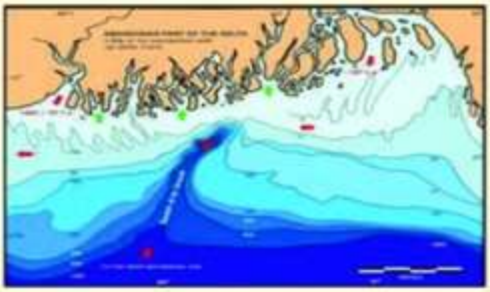

বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো- গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৩০ নং আইন) এর ধারা ১৩ (১) ও ১৩ (২) এর ক্ষমতা বলে বৈশ্বিকভাবে হুমকির সম্মুখীন প্রবাল, গোলাপি ডলফিন, হাঙ্গর, রে মাছ, সামুদ্রিক কাছিম, সামুদ্রিক পাখি, সামুদ্রিক ঘাস (Sea grass) এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও এদের আবাসস্থল সংরক্ষণ; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার মানোন্নয়ন; ব্লু ইকোনমি সমৃদ্ধকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-14) অর্জনের লক্ষ্যে ১,৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে **"সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া"** হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যার গভীরতা ৭০ মিটার পর্যন্ত।

মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়ার মানচিত্র

অন্যান্য কার্যকর এলাকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM)

Other Effective area-based Conservation Measures এর সংক্ষিপ্ত রূপ OECM। যার বাংলা অর্থ "অন্যান্য কার্যকর এলাকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা"। OECM এর এজেন্ডা হল একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ যার লক্ষ্য আনুষ্ঠানিক রক্ষিত এলাকার বাইরে জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং এর এজেন্ডার লক্ষ্যগুলি হল সংরক্ষণ নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা, রক্ষিত এলাকা এবং অন্যান্য সংরক্ষণ এলাকার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের অনুপ্রাণিত করা। OECM এজেন্ডার লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক OECM-এর প্রতিষ্ঠা এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা, সেইসাথে সরকার এবং সংরক্ষণ সংস্থাগুলির দ্বারা এই অঞ্চলগুলিকে স্বীকৃত, পর্যবেক্ষণ করা এবং রিপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে বন বিভাগ সক্রিয়ভাবে OECM প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য কাজ করছে,যেমন সম্প্রদায়-পরিচালিত বন বা কমিউনিটি ম্যানেজড ফরেস্ট এবং ইকো-পার্ক। OECM কৌশল গ্রহণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বন বিভাগ জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষার বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য

ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। IUCN এর ২০১৫ সালের জরীপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১১৬৩ প্রজাতির মেরুদন্ডী বন্য প্রাণী রয়েছে; তার মধ্যে ৪৯টি উভচর, ১৬৭ টি সরীসৃপ, ৫৬৬টি পাখি ও ১৩৮টি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ২৫৩ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ রয়েছে। অমেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে ১৪১টি ক্রাইস্টাসিয়ান ও ৩০৫টি প্রজাতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাছাড়া মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীসহ সর্বমোট ১৬১৯টি প্রাজাতি রয়েছে।

বাংলাদেশের বন, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিপুল জীববৈচিত্র্যের সমাহার, রয়েছে কতিপয় বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব। উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে ৪৭০ প্রজাতির ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া, ১৯৮৮ প্রজাতির শৈবাল, ২৭৫ প্রজাতির ছত্রাক, ২৪৮ মস জাতীয় উদ্ভিদ, ১৯৫ প্রজাতির ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ, ৭ প্রজাতির নগ্নবীজি এবং ৩ হাজার ৬১১ প্রজাতির গুপ্তবীজি (২৬৩৩ প্রজাতির দ্বি-বীজপত্রী এবং ৯৭৮ প্রজাতির একবীজপত্রী) উদ্ভিদ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে দেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে আরো বেগবান করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন প্রটোকল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে; যেমন: বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কনভেনশন (CBD), পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CMS), মহাবিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বানিজ্য এবং পরিবহন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CITES), জলাভূমি বিষয়ক Ramsar কনভেনশন, SAWEN, MIKE ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর অবস্থা (IUCN-Red list of Bangladesh 2015)

দল	মোট বসবাসরত প্রজাতি	বিলুপ্ত	মহাবিপন্ন	বিপন্ন	সংকটাপন্ন	হুমকির সম্মুখীন	ঝুকিপূর্ণ নয়	অপর্যাপ্ত তথ্য	অপর্যাপ্ত তথ্য
স্তন্যপায়ী প্রাণী	১৩৮	১১	১৭	১২	৯	৯	৩৪	৩৯	৭
পাখি	৫৫৬	১৯	১০	১২	১৭	২৯	৪২৪	৫৫	০০
সরীসৃপ	১৬৭	১	১৭	১০	১১	১৮	৬৩	২৭	২০
উভচর	৪৯	০০	২	৩	৫	৬	২৭	৬	০০
মিঠা পানির মাছ	২৫৩	০০	৯	৩০	২৫	২৭	১২২	৪০	০০
ক্রাইস্টাসিয়ান	১৪১	০০	০০	২	১১	১	৪৭	৭৯	১
প্রজাপতি	৩০৫	০০	১	১২১	৭৫	০০	৮৪	৩২	০০
মোট	১৬১৯	৩১	৫৬	১৯০	১৫৩	৯০	৮০২	২৭৮	২৮

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতির হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কিত Red-list প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী

বাংলাদেশ এক সময় প্রাণী বৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল। IUCN এর ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত শত বর্ষের ব্যবধানে আমাদের দেশ থেকে ৩১ প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি স্তন্যপায়ী, ১৯টি পাখি ও ১টি সরীসৃপ প্রজাতি। বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর তালিকায় রয়েছে ভারতীয়, সুমাত্রান ও জাভান গন্ডার, বারশিংগা, দাগী হায়না, বন গরু, কৃষ্ণ ষাঁড়, নীলগাই, শ্লথ ভল্লুক, বুনো মহিষ, মিঠাপানির কুমির, সবুজ ময়ুর, ময়ুর, গোলাপী শির হাঁস, বাদি হাঁস, সারস, রাজ শকুন, স্পটবিল্ড পেলিকেন, বড় মদনটাক, বাংলা ফ্লোরিকেন, ছোট ফ্লোরিকেন, বারটেলড্ ট্রি ক্রিপার, কালোবুক প্যারটবিল, স্পট ব্রেস্টেড প্যারটবিল, বড় প্যারটবিল, ধূসর তিতির, রোফাস থ্রটেড পারট্রিজ, রাস্ট্রি ফ্রন্টেট বারউংগ, সোয়াম্প তিতির ও সাদা বক। যদি আমরা এখনই বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদান না করি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক বন্যপ্রাণী আমাদের এই দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

One-horned Rhinoceros
Rhinoceros unicornis

Javan Rhinoceros
Rhinoceros sondaicus

Asiatic Two-horned Rhinoceros
Didermoceros sumatrensis

Swamp Deer
Cervus duvauceli

Blackbuck
Antilope cervicapra

Nilgai
Boselaphus tragocamelus

Banteng
Bos banteng

Wild Buffalo
Bubalus bubalis

Gaur
Bos gaurus

Grey Wolf
Canis lupus

Striped Hyena
Hyaena hyaena

Marsh Crocodile
Crocodylus palustris

Pink-headed Duck
Rhodonessa caryophyllacea

Common Peafowl
Pavo cristatus

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম সমূহ:

- হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox's Bazar with Myanmar and India" শীর্ষক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ১১টি Elephant Corridor চিহ্নিত করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কাপ্তাই অঞ্চলে ৭ কিলোমিটার ও শেরপুর জেলার বালিজুড়ি এলাকায় ২ কিলোমিটার সৌর বৈদ্যুতিক বেড়া বা সোলার পাওয়ার ফেন্সিং স্থাপন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণীর খাদ্য উপযোগী ৪৪৮ হেক্টর ফল, ফডার ও মিশ্র বনায়ন করা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মোট-২৭৬০ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট, বুকলেট এবং তথ্যচিত্রের মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া সভা, কর্মশালার মাধ্যমে বন্যপ্রাণী ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত জনগন, টাইগার রেসপন্স টিম, এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম এবং স্থানীয় জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যপ্রাণীর অবৈধ বাণিজ্য এবং শিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য বন বিভাগ, পুলিশ, কাস্টমস, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও বিজিবি এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

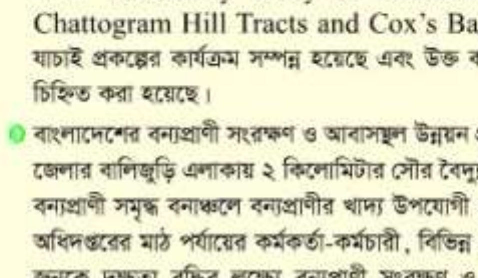

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

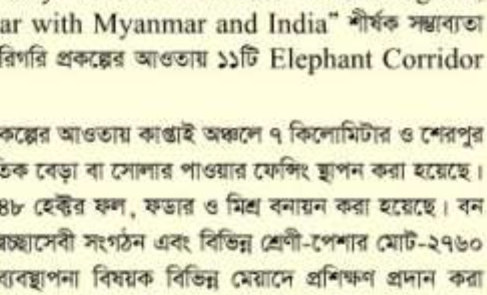

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সোলার পাওয়ার ফেন্সিং।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও অবমুক্তি কার্যক্রম।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ফল, ফডার ও মিশ্র বনায়ন।

- চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়, বিশেষত সুফল প্রকল্প এবং বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও ANR (Assisted Natural Regeneration) বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে অতি সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' প্রাণীর তালিকায় থাকা শকুন রক্ষায় ব্যাথানাশক 'কিটোপ্রোফেন' জাতীয় ব্যাথানাশক ওষুধের উৎপাদন বন্ধের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়েছে। একই সাথে কিটোপ্রোফেন জাতীয় ব্যাথানাশক ওষুধের পরিবর্তে 'ম্যালোক্সিক্যাম' নামে একটি ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শও প্রদান করা হয়েছে।
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে প্যারালাল লাইন সার্চের মাধ্যমে শতাধিক বিপদজনক মেটাল স্নেয়ার (বন্যপ্রাণী শিকারের ফাঁদ যা দিয়ে সহজেই হরিণ, শূকরের মত বন্যপ্রাণী ধরা যায়) অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া লাউয়াছড়া ও সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বিদ্যমান বৈদ্যুতিক তারে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুঝুঁকি এড়াতে সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের ভিতরের সকল অনাবৃত বিদ্যুতের তার প্রতিস্থাপন করে রাবার কোটেড তারে রূপান্তর করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত নতুন প্রজাতির হাঙর ও রে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর তফসিল ১ ও ২ সংশোধন করে নতুন গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক সুফল প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে প্রাপ্ত হাঙর ও রে প্রজাতি সংরক্ষণে National Conservation Strategy and Plan of Action for Sharks and Rays in Bangladesh প্রণয়ন এবং হাঙর ও রে এর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ৪টি প্রজাতির জন্য (Mobulid rays, Rhino rays, Silky Shark and Smooth Hammerhead Shark) নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিংস প্রস্তুত করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ নিরসনের লক্ষ্যে ২০২০ সালে 'অপরাধ উদঘাটনে তথ্য প্রদানকারীকে পুরষ্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০' জারি করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল/বিভাগ সমূহে বন্যপ্রাণীর জন্য ৭,৯১,৭৯,৫০০ টাকার পশুখাদ্য ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।
- দেশের জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এয়ারগান নিষিদ্ধ করে গেজেট করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
- সম্প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ৭.৫ কি.মি. সড়কপথে সড়ক দূর্ঘটনায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধে গাড়ীর গতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২০.০ কি.মি. রাখার বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) সনদে স্বাক্ষর করে। CITES এর তিনটি পরিশিষ্টভুক্ত প্রাণী বা ট্রফি আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে CITES এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক CITES রিপোর্টিং এবং CITES পারমিট প্রদান সংক্রান্ত এ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে রক্ষিত বনাঞ্চল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা, বিদেশে নমুনা প্রেরণ, বিদেশী বন্যপ্রাণী আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের কার্যক্রমকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১

মানুষ ও বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর অধীন ধারা-৫২ এর উপধারা-২ (ভ) অনুযায়ী চলতি বছর ২৩ মার্চ "বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১" প্রণীত হয়েছে। উক্ত বিধিমালার আওতায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
১	১ মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা)
২	গুরুতর আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে	অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
৩	সরকারি বনাঞ্চলের বাইরে লোকালয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে	অনধিক ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার টাকা)

২০১১-২০১২ থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ:

ক্রঃনং	আর্থিক বৎসর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী আক্রান্তের সংখ্যা						বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি (সংখ্যা)	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকায়)
			বাঘ		হাতি		কুমির			
			পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত		
১।	২০১১-১২	৪৮	৮	২২	৩	১৫	-	-	১	৪২.৫
২।	২০১২-১৩	৫২	১	১৬	১	৩১	-	২	১	৪৯.২৫
৩।	২০১৩-১৪	২১	১	৫	৩	১৬	-	-	-	২২
৪।	২০১৪-১৫	২১	-	-	৮	২০	-	১	-	২৫
৫।	২০১৫-১৬	১৯৪	১	-	৯	২৬	-	২	১৫৭	৫৯.১৯
৬।	২০১৬-১৭	৭৫	-	-	১	২৪	-	-	৫০	২৯.৫
৭।	২০১৭-১৮	৩১২	-	২	১	২০	-	-	২৮৯	৪৬.২৫
৮।	২০১৮-১৯	১১৫	৫	১	৭	১৬	-	১	৮৫	৪৩.০৫
৯।	২০১৯-২০	১২৩	-	-	১২	৩১	-	-	৮০	৫৪.৩৫
১০।	২০২০-২১	১৩৩	১	২	১০	১৬	-	-	১০৫	৬৯.৯৭
১১।	২০২১-২২	৫০১	১	১	৩১	১৩	১	-	৪৫৪	১৩০.৭২৫
মোটঃ		১৫৯৫	১৮	৪৯	৮৬	২২৮	১	৬	১২২৫	৫৭১.৭৮৫

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিধিমালা ও নীতিমালা:

- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীনে বাংলাদেশ কাঁকড়া রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৮ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য রপ্তানির জন্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান/খামার কর্তৃক প্রেরিত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ রপ্তানির অনুমতি বা No Objection Certificate (NOC) প্রদান করা হয়।
- হরিণ ও হাতি লালন পালন বিধিমালা-২০১৭ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে হরিণ ও হাতি লালন-পালনের জন্য আবেদনকারীদের লালন-পালনের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে কুমিরের খামার স্থাপনের জন্য কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে পোষা পাখির খামার স্থাপনের জন্য পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (Wildlife Crime Control Unit) গঠন করা হয়। সূচনালগ্ন হতেই দেশের যে কোন স্থানে বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইউনিটটি অপরাধ দমনে অভিযান পরিচালনা করে আসছে। পাশাপাশি অপরাধ প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম: সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মাইকিং, প্রচার-প্রচারণা, পথসভা, লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড স্থাপন, ভার্চুয়াল সভা ও টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউনিটের হটলাইন ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কিং সৃষ্টি, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও জরিমানা প্রদান, উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী সমূহ উপযুক্ত পরিবেশে অবমুক্তকরণ এবং বন্যপ্রাণী অপরাধের ডাটাবেস তৈরির ক্ষেত্রে ইউনিটটি অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি, সাধারণ জনগন, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেও বন্যপ্রাণী উদ্ধার, অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে জুলাই ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ইউনিটটি সর্বমোট ৪২,৫৬২ টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করত: যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

কোভিড- ১৯ পরবর্তীকালে অত্র ইউনিটটি বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন এবং বন্যপ্রাণী হ্যান্ডেলিং বিষয়ক বিভিন্ন জেলায় ১৫ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং ৫৬ টি জেলার ২৪৫ টি (রেঞ্জ/বিট/এসএফএনটিসি / এসএফপিসি/ উপজেলা পরিষদ / ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইত্যাদি) স্থানে ২৮৯ টি বন্যপ্রাণী বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করাসহ সংরক্ষণ ও সচেতনতামূলক লক্ষাধিক পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট এবং স্টিকার বিতরণ করা হয়।

জনবল:

ইউনিটটিতে বর্তমানে ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন; যার মধ্যে ১১ জন রাজস্ব খাতভুক্ত এবং ৫ জন আউট সোর্সিং নিয়োগ প্রাপ্ত।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রম:

- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় জনিত অপরাধ দমন;
- সমগ্র দেশে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, বন্যপ্রাণী অপরাধের হটস্পট (Hotspot) চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত পয়েন্টে নিয়মিত টহল প্রদান;
- নিয়মিত মামলা প্রদান ছাড়াও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান পূর্বক তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করা;

- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষা-নীরীক্ষার মাধ্যমে ট্রফি বা বন্যপ্রাণীর নমুনা থেকে প্রজাতি চিহ্নিত করা এবং জীনগত সিকোয়েন্স এর মাধ্যমে DNA বারকোড ডেটাবেস তৈরি করা;
- আহত, অসুস্থ, দলছুট অথবা বিভিন্ন কারণে লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে তাদেরকে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের (জুলাই ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০২৩) সংক্ষিপ্ত তথ্য উপাত্তঃ

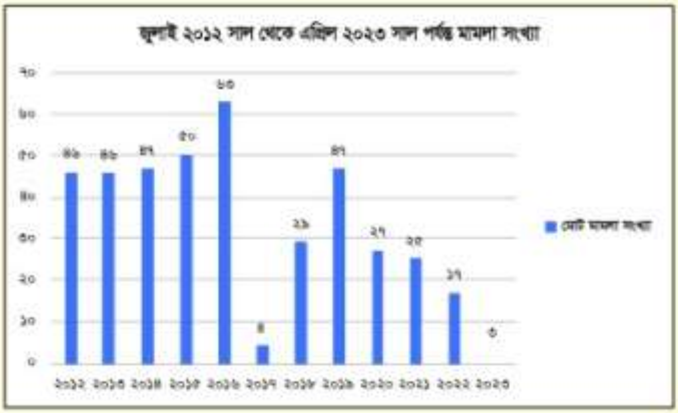

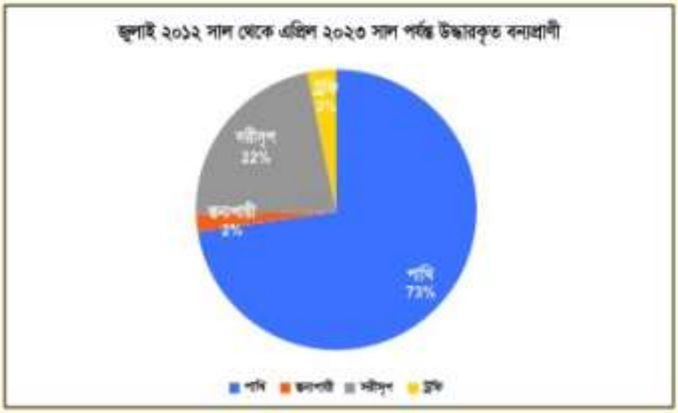

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সংক্ষিপ্ত তথ্য (জুলাই ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত) :

সাল	মোট অভিযানের সংখ্যা	উদ্ধার /জব্দকৃত বন্যপ্রাণির সংখ্যা					মোট মামলা সংখ্যা	ধৃত অপরাধীর সংখ্যা
		পাখি	স্তন্যপায়ী	সরীসৃপ	উভচর	ট্রফি		
২০২৩	১১০	৫৭১	৭১	২৬	-	-	৩	৩ জন
২০২২	৬১০	৩২৪১	২২৩	৯৩০	১৫০	৮ মণ ৭ কেজি শাপলাপাতা মাছ	১৭	৩৪ জন
২০২১	৪০৭	৩৩৯৫	২০৪	৭১৭	৫৫	২২৫	২৫	২১ জন
২০২০	৯৭	১৬৮৯	৩৫	৩৫	-	-	২৭	২৬ জন
২০১৯	১২৯	৩৭৯৬	৭৭	১৩১	-	২৯৮	৪৭	২৫ জন
২০১৮	২৪৭	২৩১০	৩৮	১৭	-	১৫	২৯	১৪ জন
২০১৭	১১২	২৪৫৫	১০	২০	-	-	০৪	০৫জন
২০১৬	১৮৫	৮১৮৯	২৯	২৪৮	-	৪০	৬৩	৩৪ জন
২০১৫	২৫৯	১৬৭৩	৩১	৬৬১৮	-	২৯৬	৫০	২৮ জন
২০১৪	২৪০	১২৫৭	২৩	৫৪৮	-	৩১৭	৪৭	৩০ জন
২০১৩	১৩৭	২২৪৩	৩২	৯২	-	০৩	৪৬	২৮ জন
২০১২	১৪১	৯৬১	১২	৪১০	-	২০৫	৪৬	৩৬ জন
মোট	২৬৭৪	৩১৭৮০	৭৮৫	৯৭৯২	২০৫	১৩৯৯	৪০৪	২৮৪ জন

বন্যপ্রাণী অপরাধ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের খন্ড চিত্র:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রকৃতিতে পাখি অবমুক্তকরণ।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট এবং র‍্যাব-১ এর যৌথ অভিযানে পাখি উদ্ধারপূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণ।

অনলাইন বিজ্ঞাপনের তথ্যের ভিত্তিতে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের উদ্ধার কার্যক্রম।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ও ডিবির যৌথ অভিযানে ০২ টি তক্ষক সহ পাচারকালে ১ আসামী আটক

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও অবমুক্তকরণ

পত্রিকায় প্রকাশিত বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রমের খন্ড চিত্রঃ

প্রথম আলো

ভালুকসহ ৩১ প্রাণীর ঠাঁই হলো সাফারি পার্কে

The Daily Star

দৈনিক ইত্তেফাক

যুগের চিন্তা

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের অভিযান

না'গঞ্জে ১৩৮টি বন্যপ্রাণী জব্দ

ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাবঃ

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ ও CITES বাস্তবায়নে বন বিভাগ ২০১৬ সালে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটে মাধ্যমে ট্রফি/ অবৈধভাবে বিক্রির নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর শরীরের প্রসেসকৃত অংশ ও ডেরিভেটিভস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণীর প্রজাতি ও উৎস চিহ্নিত করা এবং জীনগত সিকোয়েন্স এর ডেটাবেস তৈরির উদ্দেশ্যে একটি ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা বাংলাদেশে বন্যপ্রানী সংরক্ষণে মাইলফলক।

সূচনা লগ্ন হতে ল্যাবটি বন বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলিকে বন্যপ্রাণী অপরাধ সনাক্ত করণে সাহায্য করে আসছে। ফরেনসিক হচ্ছে প্রযুক্তির বিজ্ঞান সম্মত প্রয়োগ যা বন্যপ্রাণী অপরাধে ক্ষেত্রে শিকার এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্য, যা একইভাবে মানুষের অপরাধ সনাক্ত ও সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ল্যাবটিতে মাইক্রোস্কোপিক ও কনজারভেশন জেনেটিক্স উভয় প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রজাতি সনাক্ত করে থাকে। ফরেনসিক ল্যাব বন্যপ্রাণী অপরাধ এর ক্ষেত্রে ফৌজদারী প্রমাণ, হেফাজতে রাখা এবং আদালতে সংশ্লিষ্ট আলামত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে বন্যপ্রানী সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করছে।

- ল্যাব স্থাপনের পর হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩১ (একত্রিশ) টি বিভিন্ন মামলার আলামত কোর্ট এর মাধ্যমে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে এসেছে।
- অবশিষ্ট ১০ (দশ) টি মামলার বিশ্লেষণের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।
- এছাড়াও বন্যপ্রাণী রিপ্রোজটিরী উন্নয়নের লক্ষ্যে অদ্যাবধি বিভিন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর মোট ৪৪৪ (চারশত চুয়াল্লিশ) টি নমুনা রিপ্রোজিটরি নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব ডিএনএ বারকোডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল বন্যপ্রাণীর একটি জেনেটিক বারকোডিং লাইব্রেরী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। যা বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে সহযোগীতা করবে ও বন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডকে সাফল্যমন্ডিত করবে।
- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব সুফল প্রকল্প এর আওতায় "Genetics for tiger conservation Microsatellite based unified DNA fingerprinting to infer source of origin of tiger seizures in Bangladesh" শিরোনামে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

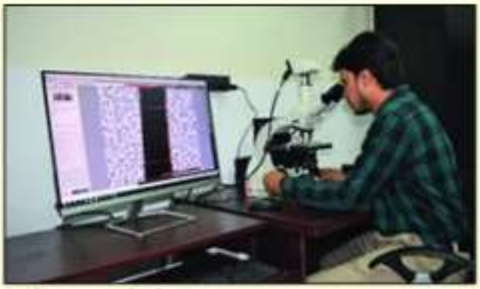

ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাবে কর্মরত ল্যাব কর্মকর্তাগণ ।

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ (ক)-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বন অধিদপ্তর কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত "স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন" প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুর সদর উপজেলায় মির্জাপুর-মাস্টার বাড়ীতে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটির শুভ উদ্বোধন করেন।

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের গেট

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের একাডেমিক ভবন

অবস্থান ও আয়তন:

ঢাকা বিভাগের অধীন গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৩ নং ওয়ার্ডের ১৮ নং আড়ইশ প্রসাদ মৌজায় বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি অবস্থিত। এটি গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তরে ৭ কি.মি. দূরে মাস্টারবাড়ী নামক স্থানে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ভিতরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পার্শে অবস্থিত যার মোট আয়তন ১৭.৫৮ একর।

লক্ষ্য:

বাংলাদেশ ও বর্হির্বিশ্বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ভিত্তিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য:

১. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা খাতের সকল পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও আগ্রহী দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগণকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান;

২. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; দেশীয় বন্যপ্রাণীর সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা; যা সংরক্ষণ ও বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহকে উপযুক্ত উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করবে; ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা;

৩. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে বন, বন্যপ্রাণীর অবাসস্থল বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং শেখ জামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারকে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা;

৪. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ে জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহিত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ

৫. দেশি ও বিদেশি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বা বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ পর্যটন

বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এ প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থেকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়। বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী-সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং সিলেটের জলাভূমির বন পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কাঁকড়া এবং আরো বিচিত্র রকমের মাছ। কুয়াকাটায় সাগর তীরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সোনার চরের ঝাউবন সমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন স্থানসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চল

সাঙ্গু সংরক্ষিত বনাঞ্চল

কেন্দ্রীয় এলাকা: ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (গাজীপুর), বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (গাজীপুর), ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (ঢাকা), বলধাগার্ডেন (ঢাকা), মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক (টাঙ্গাইল), মধুটিলা ইকোপার্ক (শেরপুর), রাজেশপুর ইকোপার্ক (কুমিল্লা) ইত্যাদি।

সিলেট এলাকা: রাতারগুল জলাভূমির বন, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, বরশীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, বিছানাকান্দি, হাকালুকী হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড় ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম এলাকা: সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (কক্সবাজার), বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এন্ড ইকোর্পাক, মহামায়া ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

পার্বত্য এলাকা: কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রাম পাহাড়, সীতা পাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাথিনের কুপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, শৈল প্রপাত, নীলাচল ইত্যাদি।

উত্তরাঞ্চল: রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি ।

দক্ষিণাঞ্চল: কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, টেংরাগিরি ইকোপার্ক, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক ইত্যাদি।

দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল: বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কটকা, হিরনপয়েন্ট, দুবলারচর, কঁচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং করমজল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীবজন্তু।

প্রকৃতি পর্যটন উপভোগ করতে হলে পর্যটকদের কিছু নিয়ম কানুন পালনের নির্দেশিকা ঃ

কি কি কাজ করা উচিত	কি কি কাজ করা উচিত নয়
১) যে জায়গায় ভ্রমণে যাবেন সে জায়গার নিয়ম-কানুন মেনে চলা যেমন: প্রবেশ ফি/পার্কিং ফি থাকলে প্রবেশ ফি/পার্কিং ফি দিয়ে প্রবেশ করা।	১) বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণির ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ না করা।
২) নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ময়লা আবর্জনা ফেলা।	২) যত্র-তত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলা।
৩) নির্দিষ্ট ট্রেইলে ভ্রমণ করা।	৩) রক্ষিত বনাঞ্চল, নদী, সাগর ও জলাশয়ে কোন ধরনের অপচনশীল দ্রব্যাদি না ফেলা।
৪) প্রয়োজনে ইকো-ট্যুর গাইড নিয়ে ভ্রমণ করা।	৪) উচ্চস্বরে মাইক ও হর্ণ না বাজানো।
৫) যে এলাকায় ভ্রমণ করা হয়, এর আশেপাশের জনগণের মূল্যবোধকে সম্মান জানানো।	৫) হৈচৈ, চিৎকার- চেঁচামেচি না করা।

সাফারী পার্ক

চিড়িয়াখানায় সকল জীবজন্তু আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং দর্শনার্থীগণ মুক্ত অবস্থায় থেকে জীবজন্তু পরিদর্শন করেন। কিন্তু সাফারী পার্কে সকল বন্যপ্রাণী উন্মুক্ত অবস্থায় বনজঙ্গলে বিচরণ করে এবং মানুষ সতর্কতার সহিত চলমান যানবাহনে চড়ে আবদ্ধ অবস্থায় জীবজন্তু পরিদর্শন করে থাকে।

সাফারী পার্কে দেশী-বিদেশী সকল বন্যপ্রাণী ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত অবস্থায় থেকে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পাবে এবং উন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করবে। বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারী পার্কের ভিতরে (in-situ) এবং বাইরে (ex-situ) মুল আবাসস্থলে সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত ও দলছুট বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা প্রদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সাফারী পার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশে সাফারী পার্ক মোট ২টি।

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার
২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার বাংলাদেশের প্রথম সাফারী পার্ক। এটি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারায় অবস্থিত। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পূর্ব পাশে ১৯৮২ সালে তৎকালীন অবিভক্ত কক্সবাজার বন বিভাগ এর ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জের ডুলাহাজারা ব্লকের ৪২.৫ হেক্টর বনাঞ্চলে একটি হরিণ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক সালে উঁচুনিচু টিলাসমৃদ্ধ চিরসবুজ এ বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এর আয়তন ৩০০ হেক্টরে বৃদ্ধি করে দেশের প্রথম সাফারী পার্ক হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার" এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে এর আয়তন বৃদ্ধি করে ৯০০ হেক্টরে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যমান সাফারী পার্কটিকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে একটি মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়; যা ২০১৬ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৯-২০২৩ আর্থিক সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাফারী পার্কটির উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডুলাহাজরা সাফারী পার্কের প্রবেশ দ্বার

সাফারী পার্ক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো-

১) প্রকৃতিতে বিলুপ্ত, অতি বিপন্ন, বিপন্ন ও ex-situ ও in situ দুর্লভ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ।
২) বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি।
৩) শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি।
৪) ইকো-ট্যুরিজম সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর বিভিন্ন বেষ্টনীতে রক্ষিত বন্যপ্রাণী সমূহ হলো স্তন্যপায়ী- ৮১ টি, সরীসৃপ-৫১ টি, পাখি-১৪৪টি। এছাড়াও সাফারী পার্কটিতে প্রায় ৩৪০ প্রজাতির উদ্ভিদ ও উন্মুক্ত অবস্থায় আনুমানিক ২০০ প্রজাতির অধিক প্রাণী রয়েছে। সাফারী পার্কে ইতোমধ্যে বাঘ, সিংহ, কালো ভালুক, জলহস্তী, গয়াল, উয়াইল্ডবিষ্ট, জেব্রা, লোনা পানির কুমির, ময়ূর, উটপাখি সহ বিভিন্ন প্রাণীসমূহের কনজারভেশন ব্রিডিং এ সফলতা পাওয়া যায়।

বিগত ৫ বছরে কনজারভেশন ব্রিডিং / কেপটিভ ব্রিডিং এ সাফল্যের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	প্রাণীর নাম	বাচ্চার সংখ্যা
১.	গয়াল	৬টি
২.	কালো ভালুক	২টি
৩.	চিত্রা হরিণ	৩০টি
৪.	জলহস্তী	৪টি
৫.	জেব্রা	৩টি
৬.	উয়াইল্ডবিস্ট	৩টি
৭.	মদনটাক	২টি
৮.	বন মোরগ	শতাধিক
৯.	কালিম	৬টি
১০.	উট পাখি	১টি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য একটি আদর্শ গবেষণা ক্ষেত্র। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা,পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণার কাজে এ পার্কে আগমন করে থাকেন। তাছাড়াও সারাদেশের স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার একটি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। উক্ত পার্কে প্রতিবছর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে আগমন করে। শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার সুবিধার্থে রয়েছে শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারী, তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র, বন্যপ্রাণী মিউজিয়াম এবং প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র।

বঙ্গবন্ধু চত্বর

থিমেটিক চিল্ড্রেন এমিউজমেন্ট পার্ক

দৃষ্টিনন্দন এম্ফিথিয়েটার

বিশেষ আকর্ষণসমূহ:

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষ্কর্য চত্বর ।
- জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ।
- থিমেটিক চিল্ড্রেন এমিউজমেন্ট পার্ক।
- দৃষ্টিনন্দন এম্ফিথিয়েটার ।
- প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত লেক এ বিভিন্ন দেশীয় ও পরিযায়ী পাখির কলতান।
- প্রাকৃতিক বন ও সৃজিত চারণভূমির অপূর্ব সংমিশ্রণে হার্বিভোর সাফারী পরিভ্রমন।
- বিভিন্ন বেষ্টনীতে রক্ষিত দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী দর্শন ও পরিচিতি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

ঢাকা থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সাফারী পার্কটির অবস্থান। ভাওয়াল গড়ের শালবন একসময় জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক প্রাণী ও গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মৌজার খন্ড খন্ড শাল বনের ৪৯০৯.০ একর বনভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩৬৯০.০ একর এলাকাকে সাফারী পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম ২০১১ সালে শুরু হয় এবং ২০১৭ সালে শেষ হয়। সাফারী পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল, বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারী ওয়ার্ল্ড (Safari World) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপন করা হয়েছে। সাফারী পার্কের চারদিকে নির্মান করা হয়েছে স্থায়ী ঘেরা এবং উহার মধ্যে দেশী/বিদেশী বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও অবাধ বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে; যাতে পর্যটকগণ চলমান যানবাহনে অথবা পায়ে হেঁটে ভ্রমন করে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করতে পারেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

সাফারী পার্কের মূল উদ্দেশ্য

১। শাল বনের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

২। বাংলাদেশের বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীকে নিজ আবাসস্থলে (in-situ) এবং আবাসস্থলের বাহিরে (ex-situ) সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন;

৩। ঢাকা মহানগরীর অতি নিকটে ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪। শালবনের বন্যপ্রাণী, যেমন-বানর, মায়া হরিণ, বেজী, বনরুই, বাঘদাস, বন বিড়াল, খরগোশ, শিয়াল, খেকশিয়াল ও অজগরসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি ও সংরক্ষন করা;

৫। এছাড়া বাঘ, সিংহ, সাম্বার হরিণ, মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, প্যারা হরিণ এবং অন্যান্য তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬। গন্ডার, এশীয় হাতী, পারিযায়ী পাখী, জলজ পাখী, কালো ভালুক, মিঠা পানির কুমির, লোনা পানির কুমির, নীল গাই, জলহস্তী ইত্যাদি বিপন্ন ও বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ;

৭। আহত ও উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার নিমিত্ত বন্যপ্রাণীর সেবাশ্রম ও হাসপাতাল স্থাপন;

৮। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

সাফারী পার্কের দর্শনীয় স্থান ও বেষ্টনী

কোর সাফারী পার্ক (Core Safari Park):
আফ্রিকান সাফারী
হরিণ সাফারী
ভালুক সাফারী
সাদা সিংহ সাফারী
সিংহ সাফারী
বাঘ সাফারী
সাফারী কিংডম (Safari Kingdom):
প্রজাপতি গার্ডেন
ফেন্সি কার্প গার্ডেন
ঝুলন্ত সেতু
ম্যাকাউ পাখিশালা
ফেন্সি কার্প গার্ডেন
৯-D Show
পর্যবেক্ষণ টাওয়ার
কচ্ছপ ও কাছিম ব্রিডিং সেন্টার
লিজার্ড পাক
ফেন্সি ডাক গার্ডেন
ক্রাউন ফিজেন্ট পাখীশালা
ধনেশ পাখীশালা
প্যারট পাখীশালা
কুমির বেস্টনী
ঘড়িয়াল বেস্টনী
অজগর বেষ্টনী
পাখি দ্বীপ
অর্কিড হাউজ
শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র
প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র
বঙ্গবন্ধু স্কোয়ার:
ফোয়ারা
তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ
ন্যাচারহিস্ট্রি মিউজিয়াম
সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা
বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা

সাফারী পার্কের প্রবেশ ও গাড়ীতে চড়ে কোর সাফারী পার্ক পরিদর্শন ফি সম্পর্কিত তথ্যাদি

- সাপ্তাহিক বন্ধ: মঙ্গলবার
- প্রবেশ ফি:

বিবরণ	ফি (টাকায়)
প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিজন	৫০ /-
অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১২ বছরের নীচে) প্রতিজন	২০ /-
ছাত্র/ছাত্রী প্রতিজন	১০/-
বিদেশী পর্যটক	১০০০/- বা ০৫ ইউএস ডলার
শিশু (০৬ বছরের নীচে)	ফ্রি

- গাড়ীতে চড়ে কোর সাফারী পার্ক পরিদর্শন ফি:

বিবরণ	ফি (টাকায়)
প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিজন	১৫০ /-
অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১২ বছরের নীচে) প্রতিজন	৫০ /-
ছাত্র/ছাত্রী প্রতিজন	৫০/-

জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে নগরায়ন, শিল্পবিপ্লব, নির্বিচারে বন ধ্বংস ইত্যাদি অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপ্তি, প্রকোপ ও আবর্তকালের পরিবর্তন জনপদকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করেছে। সে সাথে যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নতুনমাত্রা; যেমন- জলাবদ্ধতা, মরুময়তা, উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১৮ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি। সরকার এ সমস্যা মোকাবেলায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস সম্প্রচার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে যথাসময়ে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ, উপকূলীয় বাঁধ তৈরী, বাঁধ ও বাঁধ সংলগ্ন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃজন। কিন্তু নতুন মাত্রার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে আরও প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমন্বিত প্রয়াস। সম্প্রতি COP-২৬ এ বিশ্বের বনখাতের গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) হ্রাস এবং পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার লক্ষ্যে Glasgow Leader's Declaration of ২০২১ এর মাধ্যমে বিশ্বের ১৪১ টি দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশও একাত্বতা ঘোষণা করে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ বনখাতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) হ্রাস এবং পর্যায়ক্রমে বন্ধে অংঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ বনখাতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) কমানোর জন্য এবারই প্রথম Nationally Determined Contributions (NDCs) তে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বন অধিদপ্তর ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি রূপকল্প-২০৪১, এসডিজি-২০৩০, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, Voluntary National Contributions (VNC) এবং UNCBD সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী বিভিন্ন টার্গেটসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু প্রশমন ও অভিযোজনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বন খাতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে স্যাটেলাইট ইমেজ এর উপর ভিত্তি করে Forest Reference Emission Level (বনখাতের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ২০১৯ সালে UNFCCC তে দাখিল করা হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থ বছর নাগাদ হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ রোধে উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২২,৭৬০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে।

বন সেক্টরের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি

দেশের বনজ সম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, ভূমির ক্ষয় রোধ, দেশের মরুময়তা হ্রাস, কার্বন আধার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, গ্রাম বাংলার দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নসহ বনায়ন কার্যক্রম ও দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) অনুযায়ী দেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমান ২৪ শতাংশ উন্নীত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সরকারী বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি বনের বাইরের এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৫টি বিনিয়োগ, ০১টি কারিগরী ও ০১টি সমীক্ষা প্রকল্প) চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৫৪২৬২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬৮২২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৭৪৪০.০০ লক্ষ টাকা) মাত্র।

প্রকল্প তালিকা

বিনিয়োগ প্রকল্প:

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্থকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)

২। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২২)

৩। শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৪)

৪। বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২)

৫। টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)

৬। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক,কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)

৭। কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫)

৮। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫)

৯। মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)

১০। মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো-পার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)

১১। সুন্দরবন পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)

১২। চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (সিডিএসপি-অতিরিক্ত অর্থায়ন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)

১৩। সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)

১৪। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (মার্চ ২০২১ হতে জুন ২০২৫) প্রকল্প

১৫। সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫)

১৬। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (মার্চ ২০২১ হতে জুন ২০২৫)

কারিগরী প্রকল্প:

সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প-২য় পর্যায় (এসএমপি-২)(১ম সংশোধিত)(মে ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)

সমীক্ষা প্রকল্প:

Feasibility Study for Infrastructural Development and Renovation Works of Existing Structure of Forest Department (1st revised)(জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্প:

১। টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুকুর খনন ও পুনঃখনন প্রকল্প (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)।

২। সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ইকোপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (জুলাই,২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)

৩। কুকরী-মুকরী ইকোপার্ক স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)।

৪। চরফ্যাশন রেঞ্জের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)।

৫। আলতাদিঘী পুনঃখননের মাধ্যমে আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর,২০২১ হতে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)।

৬। মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সৌর বেষ্টনী স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

৭। খুলনা জেলায় শেখ রাসেল ইকো পার্ক স্থাপন প্রকল্প (জুন ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)।

৮। সুন্দরবনে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)।

৯। সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় সমন্বিত বনায়নের মাধ্যমে যমুনা নদীর চরাঞ্চল ও নাটুয়ার পাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা প্রকল্প (নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)।

১০। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)।

১১। হাকালুকি হাওড়ের হাল্লা পাখিবাড়ীর (বঙ্গবন্ধু পুরষ্কারপ্রাপ্ত) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প, হাল্লা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার প্রকল্প (অনুমোদিত) জুলাই,২০২২ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা ও সরকারী অনুদানে ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৫০,২৩২.১৭ লক্ষ টাকা। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা ১,৪৭,০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি অনুদান ৩,২৩২.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি দেশের মোট ০৮ টি বিভাগের ৩২ টি জেলার ১৮৪ টি উপজেলায় বিস্তৃত। ২৬টি বন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সহযোগীতা মূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) মূল উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক সুযোগসহ বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

১। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;

২। বনের উপর সরাসরি নির্ভরশীলতা হ্রাসসহ বনজ সম্পদ উজাড় রোধ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা সুবিধা প্রদান করা;

৩। বনের ভেতর ও বাইরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, উপকূলীয় তটরেখার সুরক্ষা এবং অতিদরিদ্র বিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা; এবং

৪। তাছাড়া বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা উন্নত করা।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ চারটি অঙ্গের আওতায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছেঃ

অঙ্গ-১। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

- বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক এবং পরিচালনা পদ্ধতি পর্যালোচনা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রস্তাব এবং ফরেষ্ট ম্যানুয়েল হালনাগাদ করণ;
- সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিরীক্ষণের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- ১.৫ লক্ষ উন্নত চারা উত্তোলনের জন্য বনায়ন নার্সারি ও ট্রেনিং সেন্টারে ৩টি টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠা;
- উন্নত পদ্ধতিতে চারা উত্তোলনে ২,০০০ নার্সারি মালিক এবং আধুনিক করাতকল ব্যবস্থাপনায় ১,০০০ করাতকল মালিক-কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সর্ম্পকে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বন অধিদপ্তরের ৩৭১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ের প্রযুক্তিগত ও ফলিত গবেষণা দ্বারা উন্মোচন; এবং
- ২০ লক্ষ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ, জনসংযোগ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করা। এছাড়া ২য় আবর্তের জাতীয় বন জরীপ সম্পাদন ও ল্যান্ডকভার ম্যাপিং ২০২১ এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

অঙ্গ-২। সহযোগিতামূলক বন এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ:

- ৫১,৬৫৫ হেক্টর অবক্ষয়ীত এবং বৃক্ষ শূন্য পাহাড়ি ও সমতল বনভূমিতে বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি ৩২,৩০৫ হেক্টর নতুন জেগে ওঠা চরে ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন
- ২০টি রক্ষিত এলাকার ২,৫০০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন
- ১১৪০ হেক্টর বন্যপ্রাণী চলাচলের পথে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির জন্য উপযোগী পশুখাদ্যের বৃক্ষরোপণ।
- ১২টি বন বিভাগের জন্য সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা/কেন্দ্রীভূত সমন্বিত বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ৬টি রক্ষিত এলাকার বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন; ৮টি প্রজাতির সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের কর্মসূচি গ্রহন।
- ৩২ টি রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
- ইতোমধ্যে ১০০০ টি উদ্ভিদের লাল তালিকা (Red listing of Plants) এবং বিদেশী আগ্রাসী প্রজাতির (Invasive Align Species) তালিকা প্রণয়ন করাসহ ৫টি রক্ষিত এলাকায় ইনভেসিভ এলিয়েন স্পিসিস নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- শেখ কামাল বন্যপ্রাণী কেন্দ্র, গাজীপুর এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- ৬১৫টি গ্রামে ১২৩০ জন কমিউনিটি সদস্যকে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ৯টি রক্ষিত এলাকায় SMART Patrolling প্রবর্তন করা।
- পাখি শুমারী এবং শিকারী পাখি (যেমন শকুন, চিল) সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- ২টি হাঙ্গর প্রজাতি ও ২টি শাপলাপাতা মাছ প্রজাতির নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিং (NDF) এবং বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- হাতি সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা অনুসারে Elephant Response Team সম্পৃক্ত করে মানুষ হাতি দ্বন্দ্ব নিরসণে কার্যক্রম গ্রহন করা।
- ৯৪ টি (২৮,৪৭৯ বর্গমিটার) দপ্তর/আবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হবে এবং মহাখালীর পুরাতন বন ভবনটির সংস্কার করা (৬,৮৩৩ বর্গমিটার)।

অঙ্গ-৩। বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ও বন সম্প্রসারণ

- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা টেকসই করার লক্ষ্যে বন ও রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ৬১৫টি গ্রামের ৪১,০০০ টি বন নির্ভর পরিবারের উন্নয়নের জন্য Livelihood Development Fund (LDF) এর আওতায় ২০.৫০ মিলিয়ন ডলার এবং Community Development Fund (CDF) এর আওতায় ৩.০৮ মিলিয়ন ডলার সংস্থান রাখা হয়েছে।
- ৬১৫ টি গ্রামে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপ-কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠন সৃষ্টির কাজ চলমান রয়েছে।
- রক্ষিত এলাকায় ৫টি নতুন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনসহ মোট ২০টি রক্ষিত এলাকায় বিকল্প আয়ের সুযোগ প্রদানের সমর্থনে ১৪৭টি গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম গঠন এবং ০৭টি এনজিওর সহায়তায় ২৭,৬৭৫ জন সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণকে সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ এবং ৪১,০০০ জন সদস্যকে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১১,০৭০ জন সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যকে ট্রেড ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- বন ও বন্যপ্রানী আইন প্রয়োগে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- আগামী ৪০ বছরে মোট ৩৩.০ মিলিয়ন টন কার্বন অপসারণ করা হবে।
- ৬৪.৩০ লক্ষ বনজ/ফলদ চারা (টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে ১.৫ লক্ষ উন্নত চারা উত্তোলন), মডেল হিসাবে ৫টি উপজেলায় বিতরণ ও রোপণের জন্য ৫.০ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হবে। এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে বিতরণের জন্য ৩৩.৫৪ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হয়েছে
- ৩,৯৫১ কি.মি. স্ট্রিপ বাগান সৃজনের কাজ চলমান রয়েছে।

অঙ্গ-৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং:

- Open Data Kit (ODK) ভিত্তিক অনলাইন এসএসপি প্রবর্তনের মাধ্যমে বনায়ন পরিবীক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।
- কম্পিউটার-ভিত্তিক হিসাব-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরী করা হবে।
- ৪১,০০০ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্যদের অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে।
- বন অধিদপ্তরের যথাসময়ে রিপোর্টিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের ফলাফলসমূহকে তৃতীয়-পক্ষের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্বাক্ষরিক সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম

বিগত ১০ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৩০ জানুয়ারি ২০২৩খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সমঝোতা স্মারকের একই অর্থনৈতিক কোডের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় সমন্বয় এবং বাস্তবায়নকাল ৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়- ৬৯৮,৭৯৮ লক্ষ টাকা (কম্পোনেন্ট ১- ১০০০ উদ্ভিদের রেড লিস্ট প্রণয়ন (কম্পোনেন্ট ২- নির্বাচিত কয়েকটি রক্ষিত এলাকায় আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন। ইতিমধ্যে ৬৮ টি কর্মশালার মাধ্যমে ১০০০ টি উদ্ভিদের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে। ক্যামব্রিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডলিস্ট ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনা প্রণয়নে সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান, মধুপুর জাতীয় উদ্যান, এবং হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানকে নির্বাচিত করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত ১৬ টি আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে বন অধিদপ্তরে সর্বশেষ বিগত ২০ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ RLCC সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ।

গণপূর্ত অধিদপ্তর

বিগত ৩১ শে আগষ্ট ২০২০ খ্রি. তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মোট ১৮৩,৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬২টি প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের মাধ্যমে মূল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট ৪৯টি প্যাকেজের টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং মোট ৪৫ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত ভবনসমূহের মধ্যে-জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় এলাকার ভবনের জন্য সফট স্টোরি নির্মাণ, শহরাঞ্চলে মূল্যবান জমির বিবেচনায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার ভবনের জন্য ২-তলার স্থলে ৪-তলা ফাউন্ডেশন, আগারগাঁওস্থ বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অতিরিক্তি একতলা নির্মাণ, এস.কে.ডাব্লিউ.সি, গাজীপুরে ৬-তলা বিশিষ্ট স্টাফ ডরমিটরি নির্মাণ ইত্যাদি প্রস্তাবিত সংশোধনের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং পাশাপাশি আরডিপিপিতে প্রতিফলন করা হয়েছে। নির্মাণকাজে প্রণীত স্থাপত্য নকসাসমূহ স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। রক্ষিত এলাকার স্থাপনা সমূহের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট শিডিউল ২০১৮ অনুসরণে নির্মাণ কাজ চলছে। আরডিপিপিতে অবশিষ্ট কাজের জন্য রেট শিডিউল ২০২২ অনুসরণ পূর্বক পুনঃপ্রাক্কলন করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সংশোধিত ব্যায় মোট ১৮৩,৫২.২২ লক্ষ টাকা যা আরডিপিপিতে অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিল্ডিং এর ডিজিটাল সার্ভে ও সয়েলটেষ্ট যথাক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি ভবনের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা প্রতিপালনের লক্ষ্যে ইএসএমপি তৈরী করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিএফআরআই) এর সাথে সমঝোতা স্মারক ২০ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। মোট ৮৬৩.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ কার্যক্রমের আওতায় (কম্পোনেন্ট ১) করাতকল ও কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ও (কম্পোনেন্ট ২) টিস্যু কালচার ও নার্সারি উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে শেষ হয়েছে। আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১৫ মাসের মেয়াদ বৃদ্ধি ও একই অর্থনৈতিক কোডের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন সাশ্রয়কৃত অর্থ আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে আরপিএ খাতে মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করত ০১ এপ্রিল ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮৩৮.৪৩ লক্ষ টাকার সমঝোতা স্মারক সংশোধন প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ, ঢাকা ও টাঙ্গাইল বন বিভাগের প্রকল্প এলাকার ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারি মালিক ও বন বিভাগের কর্মীসহ মোট ৫৪০ জনকে নার্সারি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, স'মিল ও উড প্রসেসিং বিষয়ক ৫০ জন করাতকল মালিক ও স্টাফগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রনয়ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে, বাঁশের কঞ্চিকলম, টিস্যু কালচার, গোলপাতা নার্সারি, নার্সারিতে বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ৮টি বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের (বৈলাম, চন্দন, রক্তন, হলদু, সাদা গর্জন, সিধা জারুল, পাদক, ও রিঠা) টিস্যু কালচার প্রটোকল প্রণয়ন কাজ চলছে।

সুফল প্রকল্পের বনায়নে অগ্রগতি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারের ১৩৩৯ হে. বনায়ন এবং ১০০ সি. কি.মি গোলপাতা ও ১৭৫ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে, পাশাপাশি ৩.৭৩ লক্ষ চারা উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারের ১৭৬৩০ হে. বনায়ন এবং ৫২০ সি. কি.মি গোলপাতা ও ১৩২১ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে, পাশাপাশি ১৩.৬৫ লক্ষ চারা উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩৩.৫৪ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারের ২০,৫২০ হে. বনায়ন এবং ৬৫০ সি. কি.মি গোলপাতা ও ৮৯৫ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারের ২০,৫৭২ হে. বনায়ন এবং ৬০ সি. কি.মি গোলপাতা ও ১০৬৯ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারের, ২০,৫২৮ হে. বনায়ন এবং ৩৫০ সি. কি.মি গোলপাতা ও ৪৯১ সি. কি.মি. স্ট্রিপ বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এপ্রিল ৩০ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের ৪৪৪২ হে. বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের বনায়ন কাজে Site Specific Plan (SSP) প্রণয়ন

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রারম্ভে Site Specific Plan (SSP) প্রণয়ন করার বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশ রয়েছে। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৫৯,০৪৯ হেক্টর বনায়ন এলাকার Site Specific Plan (SSP) পরিচালনা করা হয়েছে, যা যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে সার্ভারে স্থানান্তরের কাজ চলমান আছে। অনলাইনে এসএসপি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদনের জন্য একটি ড্যাসবোর্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় মাঠ-পর্যায়ে কর্মরত বিট কর্মকর্তা হতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার ইউজার একাউন্ট খোলা হয়েছে। ৩২৪ টি বন বিটের ইনডেক্স ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। একাউন্টস, ই-জিপি, আইবাস++, প্রকিউরমেন্টস, বন ব্যবস্থাপনা, বনের প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা, সাইট-স্পেসিফিক প্ল্যানিং, জলবায়ু পরিবর্তন, অফিস ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে ২০১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ১৯০৮ জন পুরুষ এবং ১১৭ জন নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও করিডোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ২,৯৪০ হে. বাগান সৃজন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরও ৬৪০ হে. বাগান সৃজন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সংকটাপন্ন ও বিপদাপন্ন নিম্নলিখিত ৮টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাতি সংরক্ষণ:

হাতি সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসণে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহে ৭২টি ইআরটি গঠন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জমাদি সরবরাহ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ৬টি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ২০১৬-২০২১ সাল অবধি সংগ্রহ করা হয়েছে। মানুষ-হাতি দ্বন্দ নিরসণে ইআরটি সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রচারণার জন্য লিফলেট ও পোস্টার তৈরী করা হয়েছে।

সার্ক ও রে সংরক্ষণ:

প্রকল্পে সার্ক ও রে সংরক্ষণে জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ কাজে ৯৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২ টি'সার্ক ও ২টি রে' প্রজাতির নন ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিংস (এনডিএফ) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সার্ক ও রে সংরক্ষণ কর্মকৌশল এবং প্ল্যান অব এ্যাকশন তৈরী করা হয়েছে এবং তা মন্ত্রণালয় কতৃক অনুমোদিত হয়েছে। উপকূলীয় মৎসজীবির মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৬টি স্থানে প্রদর্শনী ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এ কাজ প্রচারণায় পোস্টার তৈরী করা হয়েছে এবং একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরী করা হয়েছে।

শকুন সংরক্ষণ:

শকুন সংরক্ষণে ০৭ টি ভিসিটির ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। ভালচার কনজারভেশন টিমের সাথে ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভালচার কনজারভেশন টিমের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে, যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। কাজটি চলমান রয়েছে রেমা-কালেঙ্গাস্থ ভালচার ফিডিং স্টেশন মেরামতে কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং খাবার হিসেবে ৩০ টি গরু সরবরাহ করা হয়েছে। ভালচার নেস্টিং ও রুস্টিং গাছের জরীপ চালানো হয়েছে। ২০২৩ সালে মোট ২০ টি এবং ২০২২ সালে ১৮টি নেস্ট পাওয়া গেছে। সারাদেশে ১৯৩টি রেস্টিং ও রুস্টিং গাছ চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশে এবার আরও একটি এলাকায় নতুন ভাবে শকুনের বসবাস চিহ্নিত করা হয়েছে। ৭২টি অসুস্থ শকুন সেবাপ্রদান পূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। ৩টি শকুনের গায়ে ১ম বারের মত HG স্যাটেলাইট ট্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটি পোস্টার ও একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরী করা হয়েছে। ২টি আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে।

শকুন সংরক্ষণে ম্যালোক্সিক্যাম প্রচারে ঔষধ কোম্পানির সাথে ২টি সভা করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা অয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে বার্ষিক SAVE সভা আয়োজন করা হয়েছে।

পাখি সংরক্ষণ:

প্রকল্পের আওতায় ক) শিকারী পাখি সংরক্ষণ, খ) পরিযায়ী পাখির এশিয়ান ফ্লাইওয়ে, এবং গ) পাখি শুমারি ও রিংগিং বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩২টি এলাকায় সকল পাখির জরীপ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৪টি রিংগিং ক্যাম্প সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি শিকারী পাখির জরীপ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮টি আরটিসি গঠন করা হয়েছে। ২৬১টি সোয়াপ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ৬টি পরিযায়ী পাখির ফ্লাইওয়ে সাইট জরিপ করা হয়েছে এবং ৬টি সাইট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭টি ডাবিং ডাক ও ৫টি সৈকত পাখিকে জিপিএস-ট্যাগ পরানো হয়েছে। মোট ৩৫২টি পাখিকে রিংগিং পরানো হয়েছে। শিকারী পাখি, পরিযায়ী পাখি ও জলাভূমি সংরক্ষণে স্ট্রাটেজিক কনজারভেশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। দু'টি পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করা হয়েছে।

ঘড়িয়াল সংরক্ষণ: ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ফার্ম নিয়োগের টিওআর প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডলফিন সংরক্ষণ: ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ফার্ম নিয়োগের নিয়োগের জন্য ইওআই আহবান করা হয়েছে।

স্পুনবিলড স্যান্ডপাইপার: স্পুনবিলড স্যান্ডপাইপার সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ফার্ম নিয়োগের জন্য ইওআই আহবান করা হয়েছে।

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

সুফল ইনোভশেন গ্রান্টস:

প্রকল্পের ইনোভেশন গ্রান্টস ম্যানুয়েল (আইজিএম) বিশ্ব-ব্যাংকের সম্মতির বিষয়টি বিগত ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে ইআরডি কর্তৃক জানানো হয়েছে। প্রথম রাউন্ডে নির্বাচিত ১০ টির মধ্যে ০৮টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডে ৯০ টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে এবং তন্মধ্যে ১৫ টি প্রস্তাব নির্বাচিত হয়েছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট ১৪ টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডে প্রাপ্ত ৩৯টির মধ্যে ১৩টি গবেষণা প্রস্তাব রিসার্চ প্রোপোজাল ইভাল্যুয়েশন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

ছবি: সুফল প্রকল্পের নার্সারিতে দেশীয় প্রজাতির উত্তোলিত চারা

ছবি: সুফল প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কার্যক্রম গুলো হলো:

১। বাংলাদেশের বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশের মোট নয়টি রক্ষিত এলাকা হলো:

ক্রমিক	রক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
১.	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	১৭০
২.	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৫৬০
৩.	ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৩৪০
৪.	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	১৪৬
৫.	শিলন্দা-নাগডেমরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবন	২৪.১৭
৬.	নাগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবন	৪০৮.১১
৭.	পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৪০৪
৮.	শিবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	২১৫৫
৯.	ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৮৪৮
	মোট		৫০৭৫.২৮

২। ডলফিনের গবেষণা ঘাটতি বিশ্লেষন এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তার বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অর্থাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। ডলফিন এ্যাকশন প্ল্যান এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে।

৮। মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯। ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন মেলা আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটিতে ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

১০। ডলফিন সহ অন্যান্য জলজ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য Integrated Management Plan for the Swatch-of-no-ground Marine Protected area (২০২৩-২০৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (ঢাংমারী, দুধমুখি ও চাঁদপাই)-তে এই বৃদ্ধির হার ৫৫%; যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

চিত্র : শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন

সুন্দরবনের বাঘ শুমারী

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প (২০২২-২০২৫) এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৩, মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কার্যক্রম গুলো হলো:

১। বাঘ ও শিকার প্রাণী জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঘ ও অন্যান্য প্রাণী সংরক্ষণ;

২। বাঘশূন্য স্থানে বাঘ স্থানান্তরের মাধ্যমে সুন্দরবনে বাঘের আবাসস্থল সংরক্ষণ;

৩। লোকালয় সংলগ্ন সুন্দরবনে নাইলন রশির বেষ্টনী, (Village Tiger Response Team) VTRT ও (Community Patrol Group) CPG কে বাঘ সংরক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাঘ-মানুষের দ্বন্দ্ব হ্রাস;

৪। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে বাঘ সংরক্ষণে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের কার্যক্রম:

ক) ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে বাঘ জরীপ: ০১ বার (৪ রেঞ্জে এক সাথে)

খ) প্রশিক্ষণ: ২৫টি

গ) বয়স ও লিঙ্গ অনুপাতে কম বাঘ সম্পন্ন এলাকায় বাঘ স্থানান্তর, সুন্দরবন থেকে লোকালয়ে বের হয়ে আসা বাঘ স্থানান্তর

ঘ) শিকার প্রাণীর সংখ্যা নির্ণয়: ০১ বার (৪ রেঞ্জে); সুন্দরবনের প্রতি বর্গকিলোমিটারে বর্তমান শিকার প্রাণীর ঘনত্ব ১৭.৮৮ থেকে আগামী ১০ বছরে ২০-২৩ এ উন্নিতকরণ ও পরিবীক্ষণ

ঙ) খাল সার্ভে: ০১ বার (৪ রেঞ্জে)

চ) ৪৯টি VTRT (Villate Tiger Response Team) এর মাসিক সভা: ২৫০টি

ছ) পোষাক {ইউনিফর্ম-VTRT (Villate Tiger Response Team), CPG (Community Patrol Team)}: ১০৫০ সেট

জ) ভারত/টাইগার রেঞ্জ কান্ট্রি-র টাইগার রিজার্ভ এ শিক্ষা সফর (বন অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা): ২০ জন

ঞ) ঞ) বাঘের ডকুমেন্টারী তৈরি: ১টি

ট) সুন্দরবনের লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় নাইলনের রশির বেষ্টনী তৈরি: ৬০ কিমি

ঠ) সুন্দরবনে আগুন পর্যবেক্ষণের জন্য টাওয়ার: ২টি এবং অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র: ২ সেট

ড) সাইনবোর্ড (৬' x ১০'): ৬০টি

ঢ) ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ পরিবীক্ষণ

প্রকল্প অগ্রগতি:

গত ০১/০১/২০২৩ খ্রীঃ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি. সুন্দরবনের খুলনা রেঞ্জের কালাবগী স্টেশনে বাঘ জরীপের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে ২০০ টি গ্রীড, খুলনা রেঞ্জে ১৪০ টি গ্রীড, চাঁদপাই রেঞ্জে ১৪৫ টি গ্রীড ও শরণখোলা রেঞ্জে ১৮০ টি গ্রীডে ক্যামেরা স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে ৩০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে খুলনা ও সাতক্ষীরা রেঞ্জের ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর কাজ শেষ হয়েছে। বাঘের পায়ের ছাপের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সমগ্র সুন্দরবনে খাল জরীপ করা হয়। আসন্ন মৌসুমের পর আগামী ১ নভেম্বর ২০২৩ খ্রীঃ তারিখ হতে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই ও শরণখোলা রেঞ্জে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর কাজ শুরু হবে। সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর বন অধিদপ্তরের রিমস্ ইউনিটে বাঘের ছবি বিশ্লেষণ করা হবে এবং আগামী ২৯ জুলাই ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে বিশ্ব বাঘ দিবসে মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩য় বাঘ জরীপের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করবেন।

বাংলাদেশ বন মহা পরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

১৯৯৫ সনে বাংলাদেশ বন বিভাগ প্রথমবারের মতো ২০ বৎসরের জন্যে একটি বন মহাপকিল্পনা প্রণয়ন করে; যার একটি উদ্দেশ্য ছিল দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বন আচ্ছাদনে ভেতরে নিয়ে আসা। উক্ত মহাপরিকল্পনা বন ও বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য বিষয়, যেমন Sustainable Forest Management, জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, ইকোসিস্টেম সার্ভিসের ঝুঁকি, আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রতিশ্রুতি, বন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং দূর অনুধাবন (Remote Sensing) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (GIS) ইত্যাদির উপর যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে সমর্থ হয়নি। ২০ বৎসরের পুরাতন উক্ত মহাপরিকল্পনা কে ২০১৩ সালে হালনাগাদ করে পরবর্তী ২০ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ২০১৭-২০৩৭ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। হালনাগাদ বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও সংস্থার সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে, যা শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করা হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত বন অধিদপ্তরে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী পূর্বক যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন সংরক্ষকগণের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি এবং অংশীজনের মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের নিকট বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বন অধিদপ্তরের প্রবেশ মখে ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং দর্শণার্থীদের জন্য আধুনিক মানের অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাসহ শিশুদের জন্য মানসম্মত বিনোদন সম্বলিত ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশ গ্রহণে নিয়মিতভাবে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া ইনোভেশন এর দ্বারা বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদেরকে বনায়নের লভ্যাংশের চেক অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে এবং উপকারভোগীদের ডাটাবেস সম্বলিত অ্যাপস তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। বন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে চাকুরী এবং সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তোলিত বন বাগানে চারার প্রজাতির বৈচিত্র্য রক্ষা এবং গুণগতমান রক্ষাসহ বনভূমিতে জবরদখল প্রতিরোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দূর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন-সরকারী যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ড্রোন দ্বারা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাহাড়া জোড়দারকরণ, উদ্ভিদ উদ্যানসমুহের পরিবেশ সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, চারা বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালার আলোকে বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্ভাবনী কাজ ও ভাল কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে (২০২১-২০২২) প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সম্মানিত প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে
অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানি

বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার তথ্যাদি

- সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের চেক অন-লাইনে বিতরণ
- সুন্দরবনে অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রাপ্তি সহজিকরণ
- সামাজিক বনায়নের নির্বাচিত উপকারভোগী এবং অন্যান্য পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিনামা সম্পাদন ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজিকরণ
- বন অধিদপ্তরের ইকোট্যুরিজম সাইট ও নার্সারীর তথ্যাদি সম্বলিত এ্যাপ চালু করণ
- অনলাইনের মাধ্যমে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের রেস্ট হাউজ সমূহ বুকিং
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে বন্যপ্রাণী চলাচলের জন্য ক্যানোপী ব্রীজ নির্মাণ
- ডিজিটাল প্রকাশনা হিসাবে অরন্য বার্তা প্রকাশ
- বন অধিদপ্তরের সকল বনভূমির গেজেট সংগ্রহপূর্বক বন বিভাগওয়ারী ওয়েব-সাইটে প্রকাশ

ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত a2i প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ২০১৭ সাল থেকে ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে এখনও ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র সদর দপ্তরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের মধ্যম ক্যাটাগরির ১৮টি দপ্তরের মধ্যে ৫ম অবস্থানে উঠে এসেছে। চলতি অর্থ বছরে তিন ধাপে ৬০ জন কর্মচারীকে ই-নথির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের যে সকল কর্মচারী ই-নথিতে যুক্ত ছিল না তাদের ই-নথিতে যুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্মার্ট (Smart) বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নথি সিস্টেমকে আরো বেশি গতিশীল এবং আধুনিক করার নিমিত্তে ডিজিটাল নথিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে গত ১৬-১৭ এপ্রিল ২০২৩ a2i এর উদ্যোগে ডি-নথির ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে বন অধিদপ্তরের ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। শীঘ্রই ই-নথির পরিবর্তে ডি-নথির সিস্টেমে কার্যক্রম শুরু হবে।

বন অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS) একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেরও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয় এবং মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রবর্তিত জিআরএস ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশনায় এ নির্দেশিকা অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠপ্রশাসনের দপ্তরসমূহ কার্যক্রম শুরু করেন। একই সাথে বন অধিদপ্তরও অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৮২ টি, নিষ্পত্তিকৃত ১৫ টি, অনিষ্পন্ন ৬৭ টি এবং অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ১৫২ টি, নিষ্পত্তিকৃত ১৩৮ টি, অনিষ্পন্ন ১৪ টি। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৮৬ টি, নিষ্পত্তিকৃত ৬৬ টি, অনিষ্পন্ন ২০ টি এবং অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ১৪ টি, নিষ্পত্তিকৃত ০৭ টি, অনিষ্পন্ন ০৭ টি অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সভা, কর্মশালা, অভিযোগ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণসহ সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ অভিযোগ দাখিল করছে ও সেবা পাচ্ছে।

বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতীয় পুরস্কার:

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে:

১। বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

২। বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার:

বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। যথা:

i) UN declared Equitor Award 2012
ii) Wangiri Mathai Award 2012
iii) SW Earth Care Award 2012
iv) Solution Search 2013
v) HSBC-Daily Star Climate Award
vi) Champion of the Earth 2015

বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণ অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বৃক্ষরোপণ' কে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বৃক্ষরোপণ অভিযানকে একটি টেকসই স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নব্বই দশক হতে বৃক্ষরোপণে যাঁরা বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়ে থাকে।

"বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" কে আরো প্রতিযোগিতামূলক, উৎসাহব্যঞ্জক এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত নীতিমালাটি ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধন করে ১৬টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে নীতিমালাটি পুনঃ সংশোধন পূর্বক ১৬টি শ্রেণির পরিবর্তে ১০টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী)- ২০২১" প্রণয়ন পূর্বক ১০টি শ্রেণির পরিবর্তে ০৭টি শ্রেণিতে পুরস্কার প্রদানসহ পুরস্কারের অর্থ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ, প্রথম পুরস্কার- ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা), দ্বিতীয় পুরস্কার-৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার টাকা) ও তৃতীয় পুরস্কার-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন

জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/সংস্থাকে সম্মানিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation" পদক প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় এই পদক প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়ে ২০১২ সালে "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation" নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান-এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর প্রত্যেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণ পদক অথবা পদকের ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অ্যাকাউন্ট পে-ই চেক এবং সদনপত্র প্রদান করা হয়। ২০১০ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত নিম্নোক্ত ৩টি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৩৭ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ক্যাটাগরিসমূহ:

ক. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ব্যক্তিত্ব;

খ. বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা এবং

গ. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান।

সর্বশেষ ২০২২ সালে পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচিতদের তালিকা

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান
ক.	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ ব্যক্তিত্ব:	জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, সিলেট।
খ.	বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা	ড. আমিনুজ্জামান মো. সালেহ রেজা অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।
গ.	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান	Bangladesh Biodiversity Conservation Federation (BBCF) জামতলা, কারমাইকেল রোড, সেউজগাড়ী, বগুড়া।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যের কৃতিত্বস্বরূপ পুরস্কার নিচ্ছেন জনাব ইশতিয়াক উদ্দিন আহমদ, সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক

উদযাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ দিবসগুলোর উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসগুলোর তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন বিভাগ বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। নিম্নে বন বিভাগে পালনকৃত সংশ্লিষ্ট দিবসের ছবি ও তথ্য দেয়া হল:

আন্তর্জাতিক বন দিবস

২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালেও বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন দিবস পালন করা হয়। ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো "সুস্থ শরীর সুস্থ মন, যদি থাকে সমৃদ্ধ বন"। প্রতিবারের মতো বাংলাদেশ বন বিভাগ দিবসটিকে আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপন করে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী, বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, উপ-উপাচার্য, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন, প্রাক্তন পরিচালক, আইইউসিএন এশিয়া রিজিয়ন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২৩

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে ৩ মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রতি বছরই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এই দিবসটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন**, এমপি: বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ, প্রফেসর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। এ বছর বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সকলের অংশগ্রহণ, বন্যপ্রাণী হবে সংরক্ষণ"।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস-২০২৩

বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

২০০৬ সালে আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে ২০১০ সাল হতে জাতীয়ভাবে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। তবে ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার অর্থাৎ বছরে দু'টি দিন বিশ্বব্যাপী পালিত হয় এ দিবসটি। বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস-২০২২ এর প্রতিপাদ্য ছিল "Dim the lights for birds at night", যার বাংলা ভাবার্থ- "রাতের বেলা কম আলো, পাখিদের জন্য বেশী ভালো"। বন অধিদপ্তর কর্তৃক নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

বিশ্ব বাঘ দিবস

২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত বাঘ সমৃদ্ধ ১৩টি দেশের (Tiger Range Country) সরকার প্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য তৈরি ঘোষণাপত্রের আলোকেই প্রতি বছর ২৯ জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবসে উদযাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের ২৯ জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের হৈমন্তী মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন**, এমপি। ২০২২ সালের বিশ্ব বাঘ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ ছিল-"বাঘ আমাদের অহংকার, রক্ষার দায়িত্ব সবার"।

বিশ্ব বাঘ দিবস

বিশ্ব হাতি দিবস

২০১১ সালে থাইল্যান্ডের Elephant Reintroduction Foundation, কানাডার চলচিত্রকার Patricia Sims এবং Michael Clark এর উদ্যোগের ফলে প্রতি বছর ১২ আগস্ট বিশ্ব হাতি দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলশ্রুতিতে, ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ আগস্ট পৃথিবীর হাতি সমৃদ্ধ দেশসমূহে বিশ্ব হাতি দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২ সালেও বিশ্ব হাতি দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব হাতি দিবস

আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস

আন্তর্জাতিক সচেতনতা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী; জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন**, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব রাকিবুল আমিন, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আই.ইউ.সি.এন বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর।

আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস

আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস

আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী; জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন**, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব রাকিবুল আমিন, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আই.ইউ.সি.এন বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবসের ২০২২ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-"শুশুক ডলফিন রক্ষা করি, জলজ প্রতিবেশ ভালো রাখি"।

আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস

বিশ্ব জলাভূমি দিবস

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকায় একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী: জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি, মাননীয় উপ-মন্ত্রী, ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ড. আবদুল হামিদ, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ। বিশ্ব জলাভূমি দিবসের ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় " সময়ের অঙ্গীকার, জলাভূমি পুনরুদ্ধার"।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস

বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক দিবস

১. বিশ্ব জলাভূমি দিবস: ২ ফেব্রুয়ারী।
২. আন্তর্জাতিক বন দিবস: ২১ মার্চ।
৩. বিশ্ব পানি দিবস: ২২ মার্চ।
৪. বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস: ১৮ এপ্রিল।
৫. ধরিত্রী দিবস: ২২ এপ্রিল।
৬. আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস: ২২ মে।
৭. বিশ্ব পরিবেশ দিবস: ৫ জুন।
৮. বিশ্ব সমুদ্র দিবস: ৮ জুন।
৯. বিশ্ব বাঘ দিবস: ২৯ জুলাই।
১০. বিশ্ব হাতি দিবস: ১২ আগস্ট।
১১. আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস: ৬ সেপ্টেম্বর।
১২. আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস: ১৬ সেপ্টেম্বর।
১৩. বিশ্ব নদী দিবস: ২৮ সেপ্টেম্বর।
১৪. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস: ৪ ডিসেম্বর।
১৫. বিশ বন্যপ্রাণী দিবস: ৩ মার্চ।
১৬. বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস: ১০ অক্টোবর।
১৭. আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস: ২৪ অক্টোবর
১৮. আন্তর্জাতিক কাছিম দিবস: ২৩ মে।

কক্সবাজার জেলায় সংরক্ষিত বনভূমিতে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক কর্তৃক বসতি স্থাপন, বনজ সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসের তথ্যাদি

মায়ানমার এর রাখাইন প্রদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য সেখানকার নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠি বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আগমন করে। পরবর্তীতে তাদেরকে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ও টেকনাফ উপজেলার নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড শরণার্থী ক্যাম্পে পুনর্বাসন করা হয়। এর বাইরেও উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ও টেকনাফের লেদা আনরেজিস্টার্ড শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বসতি স্থাপন করে। উক্ত ক্যাম্পগুলো কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের গেজেটভুক্ত সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে অবস্থিত। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের শেষের দিকে পুনরায় তারা ব্যাপকহারে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। উক্ত জনগোষ্ঠি বনভূমিতে বসতি স্থাপন করার ফলে একদিকে যেমন বনভূমি জবরদখল হয়, অন্যদিকে তাদের জীবিকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকায় বনভূমির গাছ কর্তন ও পাচারে লিপ্ত হয়। শরণার্থী ক্যাম্প ও বনাঞ্চলে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মকান্ড ছাড়াও বন ও পরিবেশের ব্যপক ক্ষতি সাধন করে আসছে। তন্মধ্যে অন্যতম ক্ষতিকর দিকগুলো হলো-বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে বনভূমি হতে ব্যাপকভাবে জ্বালানী সংগ্রহ, পাহাড় কর্তন ও মাটি বিক্রি, অবৈধভাবে কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য পাচার, বনভূমি জবরদখলসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় প্রভাবশালী/কুচক্রিমহল কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ব্যবহার, স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধভাবে গাছ কর্তন ও পাচার কাজে শ্রমিক হিসেবে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার, রোহিঙ্গাদের সংখ্যা অত্যাধিক হওয়ায় গণস্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, সামাজিক কর্মকান্ড, গণযোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এতদ্ব্যতীত সঠিক নাম ঠিকানার অভাবে রোহিঙ্গাদের দ্বারা অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার পরও অপরাধীকে যথাযথভাবে সনাক্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূরূহ হয়ে পড়ে।

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে পুনরায় সহিংসতার কারণে গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ হতে ব্যাপকহারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি সীমান্ত অতিক্রম করে এবং প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা (নিবন্ধনকৃত আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা ১১,১৮,৫৭৬ জন) জনগোষ্ঠি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বনভূমিতে বসতি স্থাপন করে। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার কর্তৃক প্রদত্ত মায়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান কাজের হালনাগাদ অবস্থা বিষয়ক গত ১৭/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখের প্রতিবেদনে ২০১৭ সালে ৭,১৫৪ জন, ২০১৮ সালে ৩২,৮৮০ জন ও ২০১৯ সালে ৩২,৪৭৩ জন রোহিঙ্গা শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এক সাথে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি অনুপ্রবেশ করে বনভূমিতে বসতি স্থাপনকালে সীমিত জনবল নিয়ে উহা প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। উখিয়া উপজেলার কুতুপালং, বালুখালী, বালুখালী ঢালা/ময়নারঘোনা, তাজনিমা খোলা, মক্করার বিল/হাকিমপাড়া, জামতলী বাঘঘোনা, শফিউল্লা কাটা এবং টেকনাফ উপজেলার পুটিবুনিয়া, উনচিপ্রাং, আলীখালী, লেদা, জাদিমুরা, নয়াপাড়া শালবন, শামলাপুর ও কেরনতলী এলাকায় বন বিভাগের গেজেটভুক্ত বনভূমিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং বন ও বনজসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির আবাস স্থলে মোট ৩৪টি ক্যাম্প (উখিয়া-২৬টি ও টেকনাফ-৮টি ক্যাম্প/২টি পুরাতন ও ৩২টি নতুন ক্যাম্প) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের ৬,১৬৪.০২ একর বনভূমিতে বসতি স্থাপনের ফলে ২,০২৭.৫০ একর বনভূমির সৃজিত বন (প্রধানতঃ সামাজিক বনায়ন) এবং ৪,১৩৬.৫২ একর প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়ে যায়। সৃজিত বনের ক্ষেত্রে বনজসম্পদের ক্ষতির পরিমাণ ১৯৭,৯৬,৯১,৯৭৫.৭৮ টাকা। ৪,১৩৬.৫২ একর প্রাকৃতিক বনে মূলতঃ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বিবিধ প্রজাতির গাছ, লতা, গুল্ম, সানগ্রাস, উলুফুল, বাঁশ, বেত, ঔষধি গাছসহ অন্যান্য আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ ছিল। প্রাকৃতিক বনের আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ২৫৮,১১,১১,৬৬৪.৮২ টাকা মাত্র। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৪৫৬,০৮,০৩,৬৪০.৬০ টাকা মাত্র।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করার ফলে জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়। জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে উহা নিরূপন করা বাঞ্ছনীয়। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন Single Point Mooring (SPM) প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনভূমির জন্য গত সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ মাসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করা হয়েছিল।

একই জেলায় প্রায় একই ভূ-প্রকৃতির অংশ হওয়ায় Single Point Mooring (SPM) প্রকল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষয়ক্ষতির অনুরূপ হারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত ৬,১৬৪.০২ একর রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমির জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ১৪০৯,৪৮,৫৪,১৯৫.১৯ টাকা মাত্র। অর্থাৎ বনজদ্রব্য ও জীববৈচিত্র্যের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৬৫,৫৬,৫৭,৮৩৫/৭৯ টাকা (বনজদ্রব্য ৪৫৬,০৮,০৩,৬৪০/৬০ + জীববৈচিত্র্য ১৪০৯,৪৮,৫৪,১৯৫.১৯ টাকা মাত্র)। তবে, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব নিরূপনের জন্য কক্সবাজার দক্ষিন বন বিভাগের প্রস্তাবের আলোকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বন ভূমি ধ্বংস করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কর্তৃক বসতি স্থাপন

রোহিঙ্গা কর্তৃক দখলকৃত বনভূমির পরিমাপের জন্য দখলকৃত এলাকা সরেজমিনে ঘরে সীমানা বরাবর বিভিন্ন স্থানে জি.পি.এস (GPS) waypoint (Latitude & Longitude) গ্রহণ করে Computer Software এর মাধ্যমে মোট ভূমির পরিমাপ হিসেব করা হয়েছে, যাতে বাস্তবের সাথে পরিমাপের সঠিকতার (Accuracy) কিছুটা তারতম্য হতে পারে। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার কর্তৃক প্রদত্ত মায়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান কাজের হালনাগাদ অবস্থা বিষয়ক গত ১৭/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখের প্রতিবেদনে উক্ত ভূমির পরিমাণ ৬,৫০০.০ একর (আনুমানিক ২৬.০ বর্গ কিলোমিটার) হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ০৬/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, তাদেরকে ভাসানচরে স্থানান্তর এবং ক্যাম্প এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণীর ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে ২৯ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্পষ্টীকরণে উল্লেখ করা হয় যে, ১. বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য ভাসানচরে সকল সুবিধাদির সমন্বয়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিধায় কক্সবাজার জেলায় আর কোন ভূমি বরাদ্দ দেয়া যাবে না। ২. কক্সবাজার জেলায় বরাদ্দকৃত ৮,০০০ একর জমির বাইরে অতিরিক্ত কোন জমিতে রোহিঙ্গাদের বসবাসের জন্য কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। ৩. জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর তত্ত্বাবধান করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ০৬/০৯/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ০৯/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতিত অন্যত্র রোহিঙ্গাদের অবস্থানের সুযোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি উল্লেখ করে নতুন করে স্থাপনা নির্মাণ না করতে এবং বসতি স্থাপনের জন্য নতুন করে কোন বনভূমি ব্যবহার না করতে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

চিত্রঃ রোহিঙ্গা ক্যাম্প স্থাপনের ফলে বন্ধ হওয়া বন্যহাতির করিডোর

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ক্যাম্প এলাকায় চলাচলের জন্য রাস্তা, ল্যান্টিন, নলকূপ, গুদামঘর/ওয়ারহাউজ ইত্যাদি তৈরী করা হচ্ছে। বন বিভাগের গেজেটভূক্ত সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে স্থাপনা তৈরী করা হলেও উক্ত বিষয়ে বন বিভাগকে অবহিত করা হচ্ছে না। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার কর্তৃক মায়ানমার হতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান কাজের হালনাগাদ অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী বিষয়ে ১৭/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য এ পর্যন্ত ৩৫টি ক্যাম্প (ভাসানচর ০১টি সহ) ও ৩২টি সিআইসি অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এসব রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ২,১২,৬০৭ টি ঘর (অস্থায়ী শেল্টার), ৮,৯২৫টি নলকূপ, ৫৭,৩৬৩টি ল্যাট্রিন, ১৮,৫২২টি গোসলখানা, ২০ কিঃ মিঃ বিদ্যুৎ লাইন, ৫৯.৬০ কিঃ মিঃ সংযোগ সড়ক, ত্রাণ সংরক্ষণের জন্য ২০ টি অস্থায়ী গুদাম, ৭৯ কিঃমিঃ খাল সংস্কার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চার পার্শ্বে ১৪৫ কিঃমিঃ কাঁটা তারের বেষ্টনী নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও বর্তমানে ৪২ কিঃমিঃ এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১০৩ কিঃমিঃ এর কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্থাপনার সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। স্থাপনাসমূহ নির্মাণের জন্য IOM ও UNHCR সহ বিভিন্ন এনজিও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ব্যাপকহারে পাহাড় কর্তন করা হচ্ছে। এছাড়া, ক্যাম্প এলাকাতে বিদ্যমান বনভূমির পাহাড় কর্তন করে পুলিশ ক্যাম্প এবং বিভিন্ন সংস্থার অফিসের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো তৈরী করা হচ্ছে।

কক্সবাজার জেলার বনভূমি Critically Endangered এশিয়ান হাতির বাসস্থান, বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র। IUCN (International Union for Conservation of Nature) এর ২০১৭ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় প্রায় ৬৩টি এশিয়ান হাতি বাস করে। সেগুলো মূলতঃ উখিয়া, টেকনাফ এবং রামু (আংশিক) উপজেলার বনভূমিতে বসবাস করলেও পানেরছড়া-রাজারকূল এবং বালুখালী-ঘুনধুম করিডোর দিয়ে সেগুলো এ জেলা হতে বান্দরবান ও মায়ানমারে চলাচল করত। রামু ক্যান্টনমেন্ট স্থাপনের ফলে পূর্বেই পানেরছড়া-রাজারকূল করিডোরটি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৭ সালে মায়ানমার হতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি আগমন করতঃ বসতি স্থাপনের ফলে বালুখালী-ধুমধুম (নাইক্ষ্যংছড়ি-কুতুপালং-ঘুনধুম-তামরু-আঞ্জুহায়া হতে মধুরছড়া-বতলীঘোনা-বালুখালী-পালংখালী-সোয়ানখালী এলাকায় ব্যাপৃত; যার দৈর্ঘ্য ৪.৩৫ কিঃ মিঃ এবং প্রস্থ ১.১৩ কিঃ মিঃ) করিডোরটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। যাতে Elephant-Human Conflict বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে হাতির আক্রমনে অন্ততঃ ১২জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বনভূমিতে পরিকল্পনাহীন বসতি স্থাপন এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কর্তন করে আবাসস্থল ধ্বংস করায় অদূর ভবিষ্যতে হাতি খাদ্য সংকটে পতিত হবে এবং প্রজননও ব্যাহত হবে। ফলে ভবিষ্যতে হাতি - মানুষ সংঘাত ও উভয়ের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ৪,৭২৪ টি পরিবারের ১৮,৮৪৬ জন রোহিঙ্গা নাগরিককে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে। বন্যহাতির করিডোরে অবস্থিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে

কক্সবাজার জেলার বনভূমি Critically Endangered এশিয়ান হাতির বাসস্থান, বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র। IUCN (International Union for Conservation of Nature) এর ২০১৭ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় প্রায় ৬৩টি এশিয়ান হাতি বাস করে। সেগুলো মূলতঃ উখিয়া, টেকনাফ এবং রামু (আংশিক) উপজেলার বনভূমিতে বসবাস করলেও পানেরছড়া-রাজারকূল এবং বালুখালী-ঘুনধুম করিডোর দিয়ে সেগুলো এ জেলা হতে বান্দরবান ও মায়ানমারে চলাচল করত। রামু ক্যান্টনমেন্ট স্থাপনের ফলে পূর্বেই পানেরছড়া-রাজারকূল করিডোরটি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৭ সালে মায়ানমার হতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি আগমন করতঃ বসতি স্থাপনের ফলে বালুখালী-ধুমধুমু (নাইক্ষ্যংছড়ি-কুতুপালং-ঘুনধুম-তামরু-আজুহয়া হতে মধুরছড়া-বতলীঘোনা-বালুখালী-পালংখালী-সোয়ানখালী এলাকায় ব্যাপৃত; যার দৈর্ঘ্য ৪.৩৫ কিঃ মিঃ এবং প্রস্থ ১.১৩ কিঃ মিঃ) করিডোরটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। যাতে Elephant-Human Conflict বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে হাতির আক্রমনে অন্ততঃ ১২জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বনভূমিতে পরিকল্পনাহীন বসতি স্থাপন এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কর্তন করে আবাসস্থল ধ্বংস করায় অদূর ভবিষ্যতে হাতি খাদ্য সংকটে পতিত হবে এবং প্রজননও ব্যাহত হবে। ফলে ভবিষ্যতে হাতি - মানুষ সংঘাত ও উভয়ের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ৪,৭২৪ টি পরিবারের ১৮,৮৪৬ জন রোহিঙ্গা নাগরিককে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে। বন্যহাতির করিডোরে অবস্থিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে

মানুষ - হাতি দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশে অবস্থানকারী এ সকল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হলেও রান্নার জন্য কোন জ্বালানীর ব্যবস্থা করা হয়নি। জ্বালানীর ব্যবস্থা না করায় জ্বালানী কাঠের জন্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাহিরে এ বন বিভাগের ১৮৩৭.০ একর (সৃজিত বন প্রধানত সামাজিক বনায়ন ৫৮০.০ একর ও প্রাকৃতিক বন ১২৫৭.০ একর) বাগানে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে গাছ কর্তন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছ কর্তনের সাথে সাথে শিকড়ও উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। সৃজিত বনের ক্ষেত্রে বনজসম্পদের আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৬,৬৩,২৩,৬০০/-টাকা ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে আনুমানিক ক্ষতি ৭৮,৪২,১৮,৪১৭/-টাকা; অর্থাৎ মোট ক্ষতি ১৩৫,০৫,৪২,০১৭/-টাকা প্রায়। Single Point Mooring (SPM) প্রকল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষয়ক্ষতির অনুরূপ হারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি দ্বারা জ্বালানী কাঠের জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত ১৮৩৭.০ একর রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমির জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৪২০,০৫,৪৫,৬১০.৮৭ টাকা প্রায়। জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের কারণে বনজদ্রব্য ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৫৫,১০,৮৭,৬২৭.৮৭ টাকা। অর্থাৎ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কর্তৃক এ বন বিভাগের সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে বসতি স্থাপনের কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত বনভূমি (৬,১৬৪.০২ একর) ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমি (১৮৩৭.০ একর) এবং বনজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪২০,৬৭,৪৫,৪৬৩.৫০ টাকা (বনজদ্রব্য ৫৯১,১৩,৪৫,৬৫৭.৬০ + জীববৈচিত্র্য ১৮২৯,৫৩,৯৯,৮০৫.৯০) প্রায়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কর্তৃক পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল হতে জ্বালানী সংগ্রহ

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কর্তৃক পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল হতে জ্বালানী সংগ্রহ

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে ২,১২,৬০০টি পরিবারকে (Host Community সহ) বিকল্প জ্বালানী হিসেবে LPG (এলপিজি) সরবরাহ করা হয়েছে (রোহিঙ্গা পরিবার ১,৯২,৫৪৭ এবং হোষ্ট কমিউনিটি পরিবার ২০,০৫৩)। এছাড়া, কিছু কিছু স্থানে সীমিত সংখ্যক বায়োগ্যাস প্রকল্প স্থাপন করা হলেও উহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এক্ষেত্রে, সমস্ত রোহিঙ্গা ও ক্যাম্প সন্নিহিত স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে বিকল্প জ্বালানী সরবরাহের সাথে সাথে দ্রুত বৃক্ষশূণ্য এলাকায় বনায়ন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশী বিদেশি এনজিও কর্তৃক ক্যাম্পসমূহে বিগত ২০১৮ সালের বর্ষা মৌসুমে ২,০৪,৩০০টি ও ২০১৯ সালের বর্ষা মৌসুমে ৫,০০,০০০টি বিবিধ প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ সনের বর্ষা মৌসুমে আরও ২,৫০,০০০টি বিবিধ প্রজাতির চারা স্থাপন করা হয়। অবশিষ্ট এলাকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে অন্যত্র স্থানান্তর অথবা প্রত্যাবাসন করা হলে খালি জায়গায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। কক্সবাজার জেলার পাহাড়গুলো প্রধানতঃ Laterite and sandy ধরনের হওয়ায় মাটির কাঠিন্য/দৃঢ়তা খুবই কম। ফলে একটানা বেশি দিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে পাহাড় ধ্বসের সৃষ্টি হয়। ২০১৬ সালে বর্ষা মৌসুমেও পাহাড় ধ্বসে কক্সবাজার জেলায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বন বিভাগের পাহাড়ে পরিকল্পনাহীন রোহিঙ্গা বসতি তৈরী এবং রাস্তাসহ অন্যান্য স্থাপনা তৈরীর জন্য নির্বিচারে পাহাড় কর্তন এবং বৃক্ষাচ্ছাদন ধ্বংসের ফলে মাটি উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে বর্ষায় রোহিঙ্গা বসতি এলাকায় পাহাড় ধ্বসের প্রবল আশংকা তৈরী হয়েছে। ক্যাম্প এলাকাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্ষিপ্তভাবে ঘাস ও গাছের চারা রোপণ করা হলেও সেটি খুব একটা পরিকল্পিত নয়। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

ভাসানচরে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক কর্তৃক বসতি স্থাপন, বনজ সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসের তথ্যাদি

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার বঙ্গোপসাগর বিধৌত মেঘনা নদীর মোহনায় দুই যুগ পূর্বে জেগে উঠা ভাসানচর / জালিয়ার চরের স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং চাষাবাদ ও বসবাস উপযোগী করার লক্ষ্যে উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী ২০০০-২০০১ সন হতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করে আসছে। বনায়ন সৃজনের লক্ষ্যে জালিয়ার চরের ১০,০০০ একর বনভূমিকে ২০১১ সালে ৬ ধারা মোতাবেক এবং ২০১২ সালে তন্মধ্যে ৫০০০ একর বনভূমিকে ২০ ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করা হয়। এ যাবৎ ভাসানচরে মোট ৬,৫২০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা হয়েছে।

ভাসানচরে আশ্রয় নেওয়া মায়ানমার কর্তৃক জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পূনর্বাসনের কারণে ভাসানচর সংলগ্ন এ বিপুল ম্যানগ্রোভ বনভূমি আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। পাশাপাশি উক্ত বাগান সংলগ্ন এলাকার জীব বৈচিত্র্যও হুমকির সম্মুখীন। এসব জনগোষ্ঠী ভাসানচরের অন্তর্গত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থেকে জ্বালানীকাঠ, মাছ ধরার খুটি ইত্যাদি সংগ্রহ করে উপকূলীয় বনাঞ্চলকে হুমকির মুখে ফেলছে। এতে ভূমিরূপ পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় ও বনজ সম্পদ ব্যাপকভাবে ধ্বংস হচ্ছে। এসব এলাকার মাটি প্রধানত নরম, বালি এবং বেলে-দোঁআশ প্রকৃতির হওয়ার কারণে মাটির কাঠিন্য ও দৃঢ়তা কমে যাচ্ছে। ফলে কখনও সুপার সাইক্লোনের ন্যায় প্রাকৃতিক দূর্যোগের মুখে পড়লে এ চর সাগরে বিলিন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া রোহিঙ্গা কর্তৃক নিঃসরণকৃত বর্জ্যের কারণেও দূষিত হচ্ছে সাগরের নীল জলরাশি।

পরিবেশ বিরোধী এসব ময়লা আবর্জনায় হারিয়ে যেতে পারে সামুদ্রিক শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ। নষ্ট হতে পারে চরের প্রকৃতি। বনাঞ্চল শুধুমাত্র স্থলজ প্রাণীর আবাসস্থল নয় বরং সামুদ্রিক মাছ ও পাখিদেরও বিচরণ ক্ষেত্র। এসব বন ধ্বংস হয়ে গেলে জলজ ইকোসিস্টেমও ধ্বংসের মুখে পড়বে। এছাড়াও এসব রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ভাসানচর সংলগ্ন নতুন চরে বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত নতুন বাগান গুলোতে প্রতিনিয়ত জাল ফেলে মাছ ধরছে। ফলে এসব বাগানের নতুন চারা ব্যপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। নতুন চর বনায়নের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা অর্জন করে। নতুন বনায়ন সফল না হলে এসব চর পুনরায় সাগরে বিলিন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিচরণের প্রভাবে এসব চরকে বনায়নের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা দান করা এখন একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। দেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৪০০ প্রজাতির মৎস্য জাতীয় প্রাণী, ৫৩ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩৩০ প্রজাতির পাখি ও ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী রয়েছে। এ বিশাল জীববৈচিত্র্যকে রক্ষার একমাত্র উপায় হলো উপকূলীয় বনভূমি সৃষ্টি। আর এ বনের উপর রোহিঙ্গাদের দৌরাত্ম না কমলে ভাসানচর সংলগ্ন এলাকায় তা কখনও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

ভাসানচরের দৃশ্য (২০১৭ সালের গুগল আর্থ)

ভাসানচরের দৃশ্য (২০২২ সালের গুগল আর্থ)

ভাসানচরে রোহিঙ্গা আবাসন

Central Asian Flyway সম্পর্কিত তথ্য

পরিযায়ী পাখি সম্পর্কিত পৃথিবীতে যে ৯টি Flyway Site Network আছে, তন্মধ্যে Central Asian Flyway (CAF) অন্যতম। Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) এর আওতায় পরিচালিত Central Asian Flyway সংক্রান্ত কার্যক্রমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি Central Asian Flyway কার্যক্রমে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে বন অধিদপ্তর হতে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা-কে উক্ত Flyway এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

East Asia Australasian Flyway Partnership (EAAFP) Sites in Bangladesh

পরিযায়ী পাখি (Migratory Birds) প্রতি বছর যে ভৌগলিক পথে (Geographical Route) এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে পরিভ্রমন করে থাকে, তাকে উড়ন্ত পথ (Flyways) বলে। পৃথিবীতে ৯টি Flyway Site Network আছে; তন্মধ্যে বাংলাদেশ East Asian- Australasian Flyway (EAAF) ও Central Asian Flyway এর অন্তর্ভূক্ত। East Asian- Australasian Flyway Partnership ৬ নভেম্বর ২০০৬ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। EAAFP এর সদরদপ্তর দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়নে অবস্থিত। EAAFP এর বর্তমানে ৩৭ টি Partners রয়েছে; তন্মধ্যে ১৮ টি দেশ, ৬ টি Intergovernmental agencies, ১২ টি International NGOs এবং ১ টি International private enterprise অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ Flyway Partnership-এর উদ্দেশ্য হলো সরকার, সাইট ম্যানেজার, বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা, শিল্প ও সকল স্তরের সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা এবং প্রচারের জন্য একটি ফ্লাইওয়ে বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করা এবং পরিযায়ী পাখি এবং এদের আবাসস্থল সংরক্ষণ করা।

EAAF এর আওতায় বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, সিংঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড ও পূর্ব তিমুরসহ ২২ টি দেশে পরিযায়ী পাখিরা আনাগোনা করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, EAAF উড়ন্ত পথে পৃথিবীর ২৫০ প্রজাতির প্রায় ৫০ মিলিয়ন পরিযায়ী পাখি (৫ কোটি) চলাচল করে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ২৮টি পরিযায়ী পাখি আন্তর্জাতিকভাবে মহাবিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময়, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। অতিথি পাখির মধ্যে উল্লখযোগ্য হলো- রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, মান্দারিন হাঁস, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভূতি হাঁস, স্মিউ হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার, গুমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, গ্রিধিনি, মানিকজোড়, এশিয় শামোকখোল, নীলকণ্ঠ, বৈরী, চামচ ঠুটো বাটান ও বিভিন্ন জাতের সৈকত-পাখি (shore bird) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে East Asia Australasian Flyway Sites

বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬ টি এলাকাকে (টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ ও গাঙগুইয়ার চর) Flayway Site হিসেবে ঘোষণা করেছে।

গাঙগুইয়ার চর

গাঙগুইয়ার চরটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব মেঘনা মোহনায় জেগে উঠা একটি চর। এটি এখনো মানব বসতিহীন একটি বিচ্ছিন্ন কাদাচর। এই চরটির পূর্বে হাতিয়া উপজেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সন্দীপ উপজেলা এবং উত্তরে জাহাজের চর অবস্থিত। ২০১৫-১৮ সালের একাধিক জরিপে গাঙগুইয়ার চর ও এর আশেপাশের চরাঞ্চলে প্রতিবছর সর্বমোট ৪২ প্রজাতির গড়ে ২৫,০০০টি পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। এ বিশাল সংখ্যাটি বৈশ্বিক পরিযায়ী পাখিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়া এ চরের পার্শ্ববর্তী মেঘনা মোহনা বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন ডলফিন প্রজাতি ও ইলিশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নিঝুম দ্বীপ

নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ, যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী মোহনা মুখে অবস্থিত। এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত। আয়তন প্রায় ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর। ১৯৪০ এর দশকে এই দ্বীপটি বঙ্গোপসাগর হতে জেগে উঠতে শুরু করে। নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান। তবে, এটি ইছামতীর চর নামেও পরিচিত ছিল। ২০১৩ সালে দ্বীপটি জাহাজমারা ইউনিয়ন হতে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করে। শীতকালে, বিশেষত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০-২০,০০০টি পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে এ এলাকা জুড়ে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিরল ও বিপন্ন কিছু প্রজাতির পাখিরও দেখা মেলে এখানে। বিশ্বব্যাপী অতি বিরল ও মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো বাটান (Calidris pygmaea) এদের মধ্যে অন্যতম।

সোনাদিয়া

সোনাদিয়া দেশের সর্বদক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের উত্তর-পশ্চিমে এবং উপকূলীয় দ্বীপ মহেশখালীর কুতুবজং ইউনিয়নের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। আয়তন প্রায় ৪৯২৪ হেক্টর। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন এ দ্বীপটি নানা ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সোনাদিয়া কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক থেকে প্রায় ২.৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সমুদ্র সৈকতে এর দৈর্ঘ্য ১৯.২০ কিলোমিটার। কক্সবাজার থেকে উত্তর-পশ্চিমে এবং মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে সাগরের বুকে সোনাদিয়া দ্বীপটির অবস্থান।

সোনাদিয়ার প্যারাবনে প্রায় ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ২৭ প্রজাতির পাখির দেখা মিলে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এ দ্বীপেই দেখা মেলে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন পাখি চামচঠুঁটো-বাটান। শীতকালে এই দ্বীপে মহাবিপন্ন এ পাখি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কেবল সামুদ্রিক বা পরিযায়ী পাখিই নয়, দ্বীপের উপকূল ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, লবস্টার, লাল কাঁকড়া, ১৪ প্রজাতির শামুক, ঝিনুক, ডলফিন আর নানা প্রজাতির কচ্ছপের আবাসস্থল। দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে শীতকালে হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ডিম পাড়তে আসে অসংখ্য মা-কচ্ছপ।

টাঙ্গুয়ার হাওর

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তম জলমহালগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা এবং তাহিরপুর উপজেলাস্থিত জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ মিঠা পানির এ হাওর বাংলাদেশের ২য় রামসার এলাকা। স্থানীয় লোকজনের কাছে এ হাওরটি **নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল** নামে পরিচিত। বর্তমানে এ হাওরের মোট জলমহাল সংখ্যা ৫১টি এবং মোট আয়তন ৬,৯১২.২০ একর। তবে, হিজল-করচ বন ও নলখাগড়া বনসহ বর্ষাকালে সমগ্র হাওরটির আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ২০,০০০ একর। প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ এ হাওর পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম।

টাঙ্গুয়ার হাওরে ১৬৭ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়; যার মোট সংখ্যা ৬৫ হাজারের বেশি। জলচর পাখি জরিপের গণনা অনুযায়ী, প্রতি বছর শুধু শীতকালেই পৃথিবীর বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশ থেকে প্রায় ৮৪ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা এ হাওরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়। ২০২০ সালে পরিচালিত জলচর পাখিশুমারী অনুযায়ী, ৩৫ প্রজাতির ৫১,৩৬৮টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ও বিপদাপন্ন পাখি প্রজাতির মধ্যে বৈকাল-তিলিহাঁস (Sibirionetta formosa) এর দেখা মেলে। বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' এবং বিশ্বে 'বিপন্ন' প্রাণী হিসেবে বিবেচিত পালাসি-কুরাঈগলের (Haliaeetus leucoryphus) দেখা মেলে এ হাওরের হিজল-করচ গাছে। এরা শীত মৌসুমে এদেশে আসে এবং প্রজনন শেষে বর্ষা মৌসুমে উত্তর মেরুর দিকে চলে যায়। ভারত, নেপাল, ভূটান, চীন, সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের বৈশ্বিক বিস্তৃতি রয়েছে।

হাকালুকি হাওর

হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ মিঠাপানির জলাভূমি। এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর; তন্মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। এটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা (৪০%), কুলাউড়া (৩০%); সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ (১৫%), গোলাপগঞ্জ (১০%) ও বিয়ানীবাজার (৫%) জুড়ে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিকভাবে এর অবস্থান উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড় এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশে। হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ হলো জুরী এবং পানাই নদী। হাকালুকি হাওরে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের প্রায় ২৩৮টি বিল রয়েছে। প্রায় সারাবছরই বিল গুলোতে পানি থাকে। শীতকালে এসব বিলকে ঘিরে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে মুখর হয়ে উঠে গোটা এলাকা। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিচালিত জলচর পাখি শুমারী অনুযায়ী, ৫৩ প্রজাতির মোট ৪০,১২৬টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন বেয়ারের-ভূতিহাঁস (Aythya baeri), সংকটাপন্ন পাতি-ভূতিহাঁস (Aythya ferina), প্রায়-সংকটাপন্ন মরচেরং-ভূতিহাঁস (Netta rufina) ইত্যাদি পাখি প্রজাতির দেখা মেলে।

হাইল হাওর

হাইল হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার কিয়দাংশে অবস্থিত একটি বৃহদায়তন জলাভূমি। এতে রয়েছে ১৪টি বিল এবং পানি নিষ্কাশনের ১৩টি নালা। এই হাওরটির মোট আয়তন ১০হাজার হেক্টর। বাইক্কা বিলে প্রতিবছর শীত মৌসুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে। ২০১১ সালে নতুন ৪টি পরিযায়ী পাখির দেখা মিলেছে এ বিলের চারপাশের বনে; সেগুলো হলোঃ বড়ঠুঁটি-নলফুটকি, উদয়ী-নলফুটকি, বৈকাল-ঝাড়ফুটকি ও সাইক্সের-ফুটকি।

বন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১। পৃথিবীতে বনভূমির পরিমাণ ৩১%।

২। পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৯৮% বনভূমির দেশ ফ্রেঞ্চ গুয়ানা।

৩। রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, পেরু এবং ভারতে পৃথিবীর ৬৬% বন আছে।

৪। কাতার, জিব্রালটার, হলি সি, মোনাকা, নাউরচ, সান ম্যারিনো, সেইন্ট ব্যথেলিমাই, ফকল্যান্ড, আইল্যান্ড ও সালবার্ড এন্ড জেন মেইন আইল্যান্ডে কোন বনভূমি নাই।

৫। প্রতিদিন ২০০ বর্গ কিলোমিটার বন হারিয়ে যাচ্ছে।

৬। প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল।

৭। পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়নের অধিক লোক বনে বাস করে।

৮। পৃথিবীর স্থলভাগের জীববৈচিত্র্যের ৮০% বন ধারণ করে।

৯। পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ৪০% এর বেশি Tropical Rainforest থেকে উৎপন্ন হয়।

১০। পৃথিবীর মোট গ্রীন হাউস গ্যাসের ১৭.৪% ডিফরেস্টেশন এবং ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন থেকে নির্গত হয়।

১১। পৃথিবীতে বনের বায়োমাসে (Bio-mass) ২৮৯ গিগাটন কার্বন মজুদ আছে।

১২। বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) মোট পরিমাণ ৮,৪৬,০০০ হাজার টন।

১৩। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ৫৭ টন।

১৪। বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ২,৭৮,০০০ হাজার টন।

১৫। বাংলাদেশের বনে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ১৯৩ টন।

১৬। বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ৪,২৩,০০০ হাজার টন।

১৭। বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ২৯ টন।

১৮। বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ১৩৯,০০০ হাজার টন।

১৯। বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ৯৬ টন।

তথ্যসূত্র: i. National Forest Inventory 2016-2019
ii. FAO, UN-REDD, UNDP, UNEP & IUCN website
iii.বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ

বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের অর্জন

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় বন এলাকায় বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি, বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, বন অবক্ষয় রোধ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বন সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। বন ও বনের বাইরের এলাকায় (Trees outside Forest) বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন এলাকায় এবং রাস্তার ধারে, বাধেঁর ধারে, খালের ধারে ও বসতবাড়ীতে বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

- বন সম্প্রসারণ এবং বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধে ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ম্যানগ্রোভসহ সর্বমোট ১,৯৩,৪৫৩ হেক্টর ব্লক, ২৮,৫৫১ কি.মি. স্ট্রীপ বাগান সৃজন এবং বিক্রয় বিতরণের জন্য উত্তোলিত ১০ কোটি ৮৬ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়।
- উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করণের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৮০,৪০৩ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী তথা মুজিব বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারা দেশে জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা বিতরণ ও রোপন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ২০,৩২৫ টি করে বনজ, ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষের চারা জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষাচ্ছাদন সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সামাজিক বনায়নে স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং নার্সারিতে চারা উৎপাদন, পরিচর্যা, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে উপকারভোগীর এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে মহিলা সদস্য রাখা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত ২,৩৪,৮০৬ জন উপকারভোগীর মাঝে লভ্যাংশ হিসেবে ৪৪১ কোটি ২৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৯২ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং রাজস্ব খাতের ৫৮৬ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৪৪ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

- বনায়ন, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি Co-Management Committee (CMC) গঠনপূর্বক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। Co-Management Committee এর সদস্য হিসাবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে। সম্প্রতি সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা এবং পাহাড়ী, শাল ও উপকূলীয় এলাকা সংলগ্ন ৬০০ গ্রামের ৪০,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে; প্রায় ৬০০টি Community Forest Management Committee (CFMC) গঠন করা হয়েছে; যার মধ্যে ৫০% মহিলা সদস্য রয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০০৯-২০১০ হতে অদ্যাবদি ১০টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৩টি ইকোপার্ক, ২টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া (সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড ও সেন্টমার্টিন) এবং ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৭টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫২টি।
- সুন্দরবনে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে বাঘ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৬টি এবং ১১৪টি। উল্লেখ্য সুন্দরবনে ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ফলে জরিপের তুলনামূলক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের তুলনায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ২০১৮ সালে শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণের লক্ষ্যে Bangladesh Tiger Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে Bangladesh Elephant Conservation Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন, দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত এবং ট্রান্সবাউন্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে এবং হাতি উপদ্রুত এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসণে ১২০টি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিমের মোট সদস্য সংখ্যা ১২০০ জন।
- ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারণ্য সহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৭টি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ডলফিন কনজারভেশন এ্যাকশন প্ল্যানসহ ডলফিন সংক্রান্ত মোট ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল অনুমোদিত হয়েছে।
- বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' বাংলা শকুন সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা এবং দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ 'ডাইক্লোফেনাক' এবং 'কিটোপ্রোফেন' উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া Bangladesh Vulture Conservation Action Plan (২০১৬-২০২৫) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রয়কালে এ পর্যন্ত (জুলাই ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০২৩) মোট ৪২,৫৬২ টি বন্যপ্রাণী (উভচর, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও পাখি) উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে ১৩৯৯ টি ট্রফি এবং ৪০৪ টি মামলা দায়ের সহ ২৮৪ জন অপরাধীকে জরিমানা ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
- বন ও বন্যপ্রাণী সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য ২০০৯-১০ হতে অদ্যাবধি ১৪টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, ৪টি এ্যাকশন প্ল্যান, ২টি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ও বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া ১টি আইন, ৮টি বিধিমালা ও ৫ টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।
- বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বায়ুমন্ডল হতে কার্বন অপসারণ বৃদ্ধিকল্পে Bangladesh National REDD+ Strategy (২০১৬-২০৩০) এবং REDD+ ব্যবস্থাপনা কাঠামোসমূহের গঠন অনুমোদিত হয়েছে।

রাস্তার ধারে সামাজিক বনায়ন

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক বনায়ন

সুন্দরবনে SMART Patrolling

বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত কতিপয় প্রয়োজনীয় তথ্য

- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এ বর্ণিত বন্যপ্রাণীর সংজ্ঞানুযায়ী আমাদের চারপাশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার প্রাণী, যেমনঃ শিয়াল, বেজি, খেঁকশিয়াল, টিয়া, চড়ুই, শালিক, মুনিয়া, ব্যাঙ, কচ্ছপ ও সাপ বন্যপ্রাণীর অন্তর্ভূক্ত।
- বিদেশী বা পোষা পাখি (Cage bird), যেমন-বাজরিগার, লাভ বার্ড, ম্যাকাও, কবুতর ইত্যাদি পাখি সৌখিনভাবে যে কেউ বাসায় পুষতে পারেন। তবে, দেশীয় কোন প্রজাতির পাখি নয়।
- CITES অর্থ হল Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora এটি একটি আন্তজার্তিক কনভেনশন, যা সারাবিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণীর বৈধ ব্যবসা ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী দেশীয় প্রজাতির পাখিসহ সকল বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। বিধায় দেশীয় প্রজাতির পাখির কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবেনা এবং খাঁচায় আটকে রাখা যাবেনা।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী লাইসেন্স বা পারমিট ব্যাতিত যে কোন প্রজাতির সাপ বা বানর ধরা, নিজ হেফাজতে আবদ্ধ অবস্থায় দখলে রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। সে কারণেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সাপ ও বানরের খেলা প্রদর্শন করা যাবেনা।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর বিধান মতে, লাইসেন্স অথবা পারমিট প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে কোন বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী বা নিজ হেফাজতে আবদ্ধ অবস্থায় দখলে রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। সঙ্গতঃ কারণেই কবিরাজগণ বন্যপ্রাণীর অংশ-বিশেষ নিয়ে ক্যানভাস করে রাস্তা-ঘাটে ঔষধ বিক্রয় করতে পারবেন না।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধি অনুসরণপূর্বক খামার স্থাপন ও বন অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স গ্রহণ সাপেক্ষে চিত্রা হরিণ (Spotted Deer) ও এশীয় হাতি (Asiatic Elephant) এবং লোনা পানির কুমির ও বিদেশী পোষা পাখি (Cage bird) লালন-পালন করা যায়
- বন সংরক্ষকের কার্যালয়, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা হতে বন্যপ্রাণী বিষয়ে যে কোন গবেষণার অনুমতি গ্রহণ করা যায়। এছাড়াও হরিণ ও হাতি লালন-পালনের জন্য লাইসেন্স এবং বিদেশী পোষা পাখি লালন-পালন ও আমদানী সংক্রান্ত NOC (No Objection Certificate) প্রদান করা হয়ে থাকে।
- হাতির দ্বারা রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজার বা দোকান ইত্যাদি স্থানে চাঁদাবাজী ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরূপ ঘটনা দেখামাত্র নিকটস্থ থানাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- আপনার একটি ফোনকল একটি বন্যপ্রাণী বা পাখির জীবন রক্ষা করতে পারে। বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত কোন ঘটনা দেখা বা জানামাত্র বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (WCCU) এর হট নাম্বার (০১৯৯৯০০০০৯৫) -এ কল করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০২৩ খ্রিঃ।

সম্পাদনা ঃ তথ্যকণিকা ও সাইটেশন প্রকাশনা উপকমিটি-২০২৩, বন অধিদপ্তর।

> বৃক্ষ ও বনের সুরক্ষায়
> সকলের অংশগ্রহণ জরুরি।
> এই বর্ষায় আপনার বৃক্ষ রোপণ উদ্যোগে
> নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সবুজ হয়ে উঠুক।

Arannayk
foundation